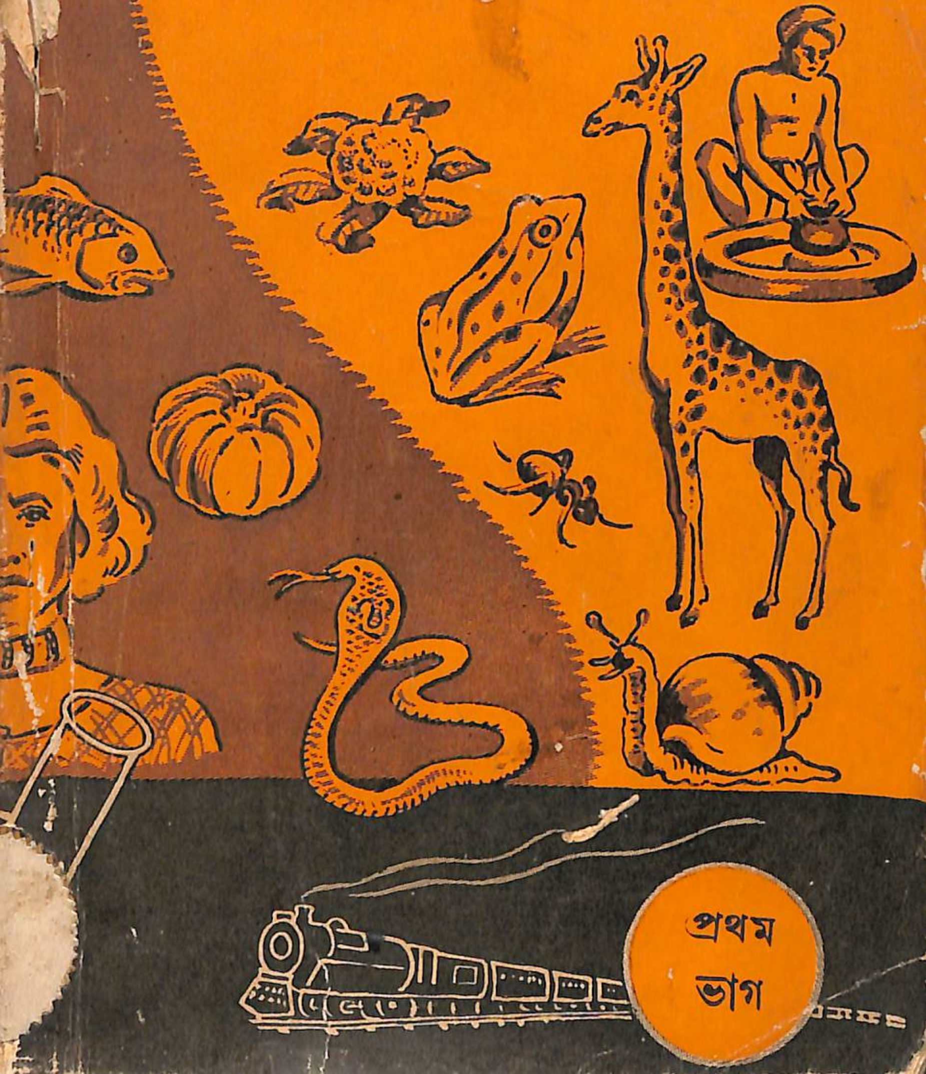
বিজ্ঞানের কথা



প্রথম ভাগ

Approved by the D.P.I., West Bengal, as a textbook for Class V of H.E., M.E., Junior Basic Schools, Junior & High Madrashas in West Bengal, (*vide* D.P.I.'s Notification No. 10 T. B. of 10-12-55).

Re-approved by the D. P. I., West Bengal.
(Vide Notification No. 9 T. B. of 8-11-56)

বিজ্ঞানের কথা

প্রথম ভাগ

(পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা, বেলিয়াঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের বিজ্ঞানের
অন্যতম সিনিয়র শিক্ষক
শ্রীসুধাংশুভূষণ নায়ক, বি. এস্. সি.
প্রণীত

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

নালন্দা প্রেস
(পাবলিকেশন বিভাগ)
১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মূল্য এক টাকা চার আনা মাত্র।

নালান্দা প্রেস্, ১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের কথা

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

গাছের জীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার কাজ

গাছের জীবন—আমাদের জীবনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ প্রভৃতি শরীরের অংশগুলি—প্রতি মুহূর্তে আমাদের জন্য কত কাজ করিতেছে দেখ। আমরা নাক দিয়া প্রশ্বাস টানিতেছি, মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছি, নতুবা আমরা বাঁচিয়াই থাকিতে পারিতাম না।

গাছ সজীব পদার্থ—ইহারা বাঁচিয়া আছে, ইহাদের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। গাছকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ইহাদের শরীরের নানা অংশ নানা কাজ করে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীর মত ইহাদেরও শ্বাস টানিবার ও খাইবার প্রয়োজন আছে। আবার প্রাণীর মত গাছও মরিবার আগে তাহার বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যায়।

এইবার গাছের কোন্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি কাজ করে তাহা শোন।

গাছের প্রধান অংশ—মাটির নীচে গাছের যে অংশ থাকে তাহার নাম **শিকড়** বা **মূল**। মাটির উপরের অংশগুলি—**পাতা, ফুল ও ফল**—তোমাদের পরিচিত। কিন্তু গাছের **কাণ্ড** বলিলে কি বোঝায় জান? গাছের দেহ হইতে সব পাতা, ফুল, ফল ও ডালপালা ছিঁড়িয়া ফেলিলে যে ডাঁটাটি থাকিল উহাই গাছের কাণ্ড।

মূলের কাজ

শক্ত মাটি হইতে একটা চারাগাছ উপড়াইয়া আনিতে চেষ্টা কর। দেখিবে বেশ একটু জোর লাগে, কারণ মূল মাটির মধ্যে ঢুকিয়া মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

গাছ মাটি হইতে উপড়াইয়া রাখিয়া দিলে অথবা গাছ কাটিয়া মূল হইতে পৃথক করিলে গাছ মরিয়া যায়। আবার মাটিতে রস না থাকিলেও ছোট চারাগাছ বা ঘাস মরিয়া যায়।

সুতরাং মূল যে মাটিকে এত শক্ত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে তাহার কারণ আছে। মূলের সাহায্যে গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করে। ঐ রস হইতেই গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়। সেই কারণে মূল ও তাহার শাখা-প্রশাখা মাটির ভিতরে নানা দিকে চলিতে থাকে। ইহার ফলে আরও একটি কাজ হয়—ঝড়ের আঘাতে গাছ পড়িয়া যায় না। সুতরাং মূলের প্রধান কাজ দুইটি—

(১) গাছকে মাটির সহিত শক্ত ভাবে আটকাইয়া রাখা।

(২) মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া গাছকে বাঁচাইয়া রাখা।

প্রকৃত ও অস্থানিক মূল—বীজ হইতে গাছ জন্মিবার কালে প্রথমে গাছের গোড়া হইতে যে মূল বাহির হয় উহাই গাছের আসল শিকড় বা **প্রকৃত মূল**। পরে কোনও কোনও গাছের অন্য স্থান হইতেও মূল বাহির

হয়। গাছের আসল বা প্রকৃত মূল ছাড়া অন্য স্থান হইতে যে মূল বাহির হয় তাহাকে **অস্থানিক** মূল বলে। গাছের অস্থানিক মূল গাছের জন্য নানা কাজ করিয়া থাকে।

স্তম্ভমূল—তোমরা বট গাছ দেখিয়াছ। বট গাছ প্রকাণ্ড বড় হয়। ইহার ডালগুলি কিছু মোটা হইলেই ঐগুলি হইতে স্থানে স্থানে মোটা সূতার মত কতকগুলি ঝুরি নামিতে থাকে। ধীরে ধীরে ঐগুলি আসিয়া মাটিতে ঢুকিয়া রীতিমত মূলে পরিণত হয়। ক্রমে ঐগুলি বড় ও শক্ত

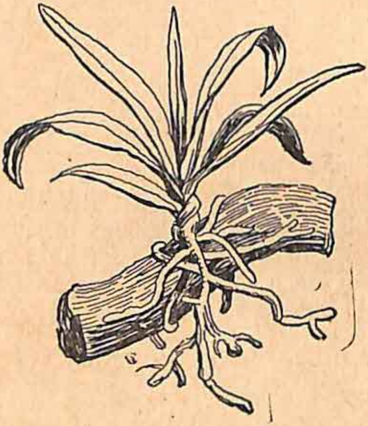


স্তম্ভমূল

হইয়া এক-একটা থামের মত মোটা হয়। এই কারণে ঐগুলিকে **স্তম্ভ-মূল** বলে। ঐ স্তম্ভমূল তখন মোটা ও ভারী ডালগুলির ভার রক্ষা করে এবং সাধারণ মূলের ন্যায় মাটি হইতে রসও শোষণ করে।

প্রথমে ঝুরির মত নীচে নামে বলিয়া ইহাকে ঝুরি মূলও বলা হইয়া থাকে।

বায়বীয় মূল—পুরানো আম গাছের ডালের উপর মাঝে মাঝে এক রকম ছোট ছোট গাছ জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদের কান্ড দেখা যায় না এবং শাখা-প্রশাখা থাকে না। ইহাদের পাতা অনেকটা আখ গাছের পাতার মত, কিন্তু অনেক বেঁটে, পুরু ও নরম। ঐগুলিকে রাস্না বলে। রাস্না গাছে মাঝে মাঝে পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা চমৎকার ফুলের মঞ্জরী ধরে।

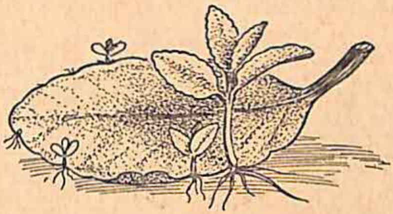


রাস্নার বায়বীয় মূল

রাস্নার প্রকৃত মূল আমগাছের ছালের মধ্যে ঢুকিয়া যায়, এবং আম গাছ মাটি হইতে যে রস টানে তাহার সাহায্যেই পুষ্ট হয়। কিন্তু ইহার কয়েকটি অস্থানিক মূল গাছের গোড়ার একটু উপর হইতে বাহির হইয়া বায়ুতে ঝুলিতে থাকে। ঐ মূলের সাহায্যে রাস্না বায়ু হইতে খাদ্য শোষণ করে। ঐরূপ মূলকে **বায়বীয় মূল** বলে।

পত্রজ মূল—পাথরকুচির পাতা হইতে উহার নূতন গাছ জন্মে। একটা পরিণত পাথরকুচির পাতা মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে পাতার কিনারা

হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া অনেকগুলি নূতন গাছ জন্মে। পাতা হইতে বাহির হয় বলিয়া ইহাকে **পত্রজ মূল** বলে।



পাথরকুচির পত্রজ মূল

ঠেস মূল—কেয়া গাছ দেখিতে অনেকটা আনারস গাছের মত কিন্তু আনারস গাছ অপেক্ষা অনেক উঁচু।



কেয়ার ঠেস মূল

ঐ গাছের শিকড়ের দিকের কান্ড সরু থাকে, ফলে গাছ সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য এই গাছের উপরের কান্ড হইতে কতকগুলি লম্বা ও সোজা মূল বাহির হইয়া চারিদিকের মাটিতে

ঢুকিয়া যায় এবং গাছটিকে যেন চারিদিক হইতে ঠেস দিয়া খাড়া রাখে। সেইজন্য কেয়া গাছের ঐরূপ অস্থানিক মূলকে **ঠেস মূল** বলে।

আরোহী মূল—লতা গাছের নিকটে কোন সাধারণ গাছ থাকিলে লতা তাহার গা বাহিয়া উঠে। ঐ জাতীয় কোন কোন গাছের লতানে কাণ্ড হইতে স্থানে স্থানে মূল বাহির হইয়া আশ্রয়-বৃক্ষের কাণ্ডে স্থানে স্থানে জড়াইয়া ধরে। ঐরূপ মূল লতানে গাছকে আশ্রয়-বৃক্ষে চড়িতে অর্থাৎ আরোহণ করিতে সাহায্য করে বলিয়া ঐ মূলকে **আরোহী মূল** বলে।



আরোহী মূল

পান, গজ-পিপুল প্রভৃতি লতানে গাছের ঐরূপ অস্থানিক মূল বাহির হয়।

আরও বহু প্রকার অস্থানিক মূল আছে, এখানে কেবল তোমাদের পরিচিত কতকগুলির কথা বলা হইল।

কাণ্ডের কাজ

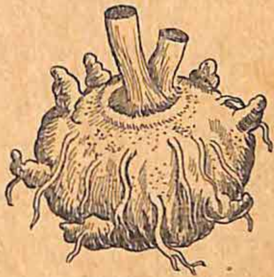
কাণ্ডের প্রধান কাজ—গাছের জীবনে কাণ্ড কত প্রয়োজনীয় তাহা ভাবিয়া দেখ।

গাছের কাণ্ড, ডাল-পালা, পাতা প্রভৃতি সমস্ত অংশেই প্রচুর তরল রস আছে। গাছের মূলই মাটি হইতে ঐ রস শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু মূল যে রস শোষণ করে কাণ্ডই তাহা পাতায় পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাই কাণ্ডের প্রধান কাজ। কাণ্ড গাছের শক্ত কাঠামো, ইহা হইতেই ডাল-পালা বাহির হয়, ইহাতে ফল ফুল ধরে।

কিন্তু সব গাছের ডাল-পালা থাকে না। তাল, সুপারি, নারিকেল, আখ প্রভৃতি এক বিশেষ শ্রেণীর গাছ, ইহাদের ডাল-পালা হয় না।



মানকচু



ওল

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড—কোন কোন গাছের কাণ্ড মাটির নীচেও থাকে। ওল, আলু, আদা, পেঁয়াজ প্রভৃতি বহু গাছের আসল কাণ্ডটি মাটির নীচে থাকে। ঐরূপ কাণ্ডকে **ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড** বলে।

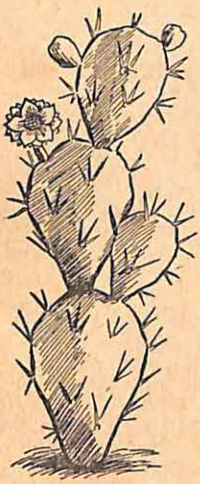


আদা

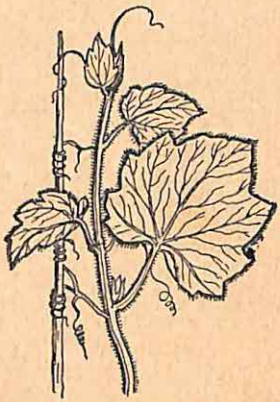
কাঁচা আদা বা হলুদ পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখিবে উহার গায়ে কুঁড়ি আছে। ঐ কুঁড়ি আবার খুব পাতলা একখানা কাগজের মত পাতলা পর্দা দিয়া ঢাকা। ঐ পাতলা পর্দাটিকে **শল্ক-পত্র** বলে। মাটির নীচের শিকড়ের মত জিনিসটি, শিকড় কি কাণ্ড তাহা ঐ কুঁড়ি দেখিলে চিনিতে পারা যায়।

মূলে কুঁড়ি ও শল্ক-পত্র থাকে না, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে তাহা থাকে। ঐ কুঁড়ি হইতে নূতন গাছ জন্মে।

রূপান্তরিত কাণ্ড—কাণ্ডের কোন কোন অংশ অথবা সব অংশই কখন কখন পরিবর্তিত হইয়া অন্য রূপ ধরে। ঐগুলিকে **রূপান্তরিত কাণ্ড** বলে।



ফণীমনসা



মিষ্টিকুমড়া গাছের আকর্ষ

লাউ বা মিষ্টি কুমড়া গাছের কাণ্ড হইতে সূতার মত আঁকড়ি বাহির হয়। ঐগুলিকে **আকর্ষ** বলে। আকর্ষের সাহায্যে লতানে গাছ কোন কঞ্চি, কাঠি ইত্যাদি জড়াইয়া উপরে উঠে।

কোন কোন গাছের কাণ্ড চেপ্টা হইয়া সবুজ রং ধরে। ফণীমনসা, নাগফণা ঐ জাতীয় গাছ। ইহার কাণ্ড প্রায় পাতার মত চেপ্টা কিন্তু খুব পুরু। ঐ চেপ্টা কাণ্ড হইতে আবার কাঁটা বাহির হয় ও ফুল ফোটে। কাঁটা দ্বারা গাছ নিজেকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

পাতার কাজ

বসন্তকালে গাছে নূতন পাতা দেখা দেয়, তখন গাছগুলিকে খুব সুন্দর দেখায়। সুতরাং পাতা গাছের সৌন্দর্য বাড়ায়। কিন্তু গাছের সৌন্দর্য বাড়ানোই পাতার আসল কাজ নহে।

চাল, ডাল আমাদের খাদ্য বস্তু, কিন্তু ঐগুলি সংগ্রহ করিলেই চলে না —ঐগুলি রান্না করিয়া আমরা উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করি। সেইরূপ মূল যে রস মাটি হইতে টানিয়া তোলে তাহা গাছের খাদ্য ; কিন্তু মূল ঐ রস টানিয়া তুলিলেই চলে না। ঐ রসকে 'রান্না' করিয়া গাছ উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লয়।

মূল যে রস টানিয়া তোলে, কাণ্ড তাহা পাতায় পেঁাছাইয়া দেয়। পাতাই গাছের রান্নাঘর। সেইখানে পাতার সবুজ কণার সাহায্যে সূর্য-কিরণের তাপে ঐ রস রান্না হয়—অর্থাৎ পরিবর্তিত হইয়া গাছের উপযুক্ত খাদ্যে পরিণত হয়।

অঙ্গারাত্মকরণ—বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক অঙ্গার ও অক্সিজেন গ্যাসের মিলনে উৎপন্ন এক গ্যাস মিশ্রিত আছে। বায়ুর মধ্যে কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি পোড়াইলে ঐ গ্যাস উৎপন্ন হয়। আমরা নিঃশ্বাসের সহিতও ঐ গ্যাস বায়ুতে ছাড়িয়া দিই। ইহাতে বায়ু দূষিত হয়। সূর্যকিরণ পাইলে সবুজ কণার সাহায্যে পাতা বায়ুর ঐ গ্যাস—অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড—হইতে কার্বন বা অঙ্গার শোষণ করিয়া লইয়া খাদ্য রসের সঙ্গে মিশাইয়া দেয় এবং অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। পাতা এইভাবে গাছের জন্য অঙ্গার গ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে **অঙ্গারাত্মকরণ** বলে।

অক্সিজেন বিশুদ্ধ বায়ুর এক উপাদান। সুতরাং উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন বায়ুতে ফিরাইয়া দিয়া দূষিত বায়ু শোধন

করে। উদ্ভিদ ঐরূপ না করিলে ধীরে ধীরে বায়ুর সব অক্সিজেন কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যাইত।

প্রস্বেদন—মাটি হইতে মূল যে রস টানিয়া তোলে তাহার সঙ্গে অনেক জলও থাকে কিন্তু এত জল গাছের প্রয়োজনে লাগে না। অতিরিক্ত জল গাছের পাতার উপর হইতে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। ইহাকে **প্রস্বেদন** বলে।

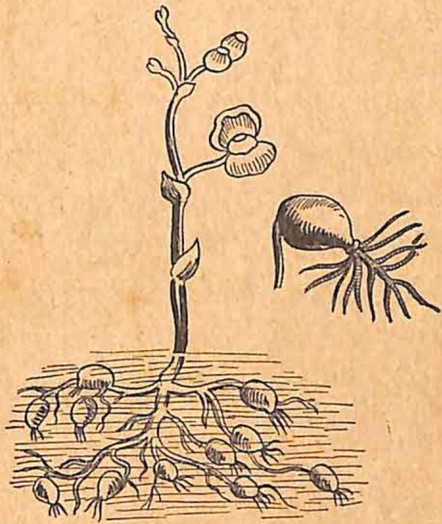
শ্বাসকার্য—গাছের প্রায় সব অংশই বায়ু টানিয়া লইয়া শ্বাসকার্য চালাইতে পারে। পাতাও ঐ কাজ করে, অর্থাৎ গাছের পাতা উহার খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া **শ্বাসকার্য** চালায়।

সুতরাং পাতার প্রধান কাজ তিনটি—**অঙ্গারাত্মকরণ, প্রস্বেদন** ও **শ্বাসকার্য**।

পাতার বিশেষ কাজ—কোন কোন গাছের পাতার গায়ে কাঁটা বা শুঁয়া থাকে। ইহার ফলে কোনও জন্তু ঐ গাছের পাতা খাইতে পারে না। বিছুটি গাছের পাতায় শুঁয়া আছে, শিয়াল কাঁটা গাছের পাতায় কাঁটা আছে। এই শুঁয়া ও কাঁটা দ্বারা গাছ আত্মরক্ষা করে।

শুধু তাহাই নহে, কোন কোন গাছ আবার পাতার সাহায্যে কীট পতঙ্গ ধরিয়া হজম করে। আমাদের দেশে অনেক পুকুরে এক রকম জলজ উদ্ভিদ জন্মে। ইহাকে **ঝাঁঝি দাম** বলে। ঝাঁঝি দামের সরু সরু যৌগিক পত্র জলের নীচে থাকে। আর ঐ পাতার এক-এক অংশ পোকা ধরিবার ফাঁদে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রত্যেক ফাঁদ এক একটি ছোট কুঠুরী। উহার একটি কপাট থাকে, উহা বাহির হইতে ঠেলিলে ভিতর দিকে খোলে কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে বাহিরের দিকে খোলে না।

ছোট ছোট জলচর পোকারা ঐ ফাঁদের কপাট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলে



ঝাঁঝি দাম ও তাহার পোকা ধরিবার ফাঁদ



কলস উদ্ভিদ

আর বাহিরে আসিতে পারে না। তখন ঐ গাছ ঐ পোকাকে হজম করিয়া ফেলে।

আসামে এক প্রকার গাছ আছে উহাকে **কলস-উদ্ভিদ** বলে। ঐ গাছের পাতার আগায় একটি কলসের মত অংশ থাকে। ঐ অংশের উপর দিকে একটি ছোট পাতার মত উজ্জ্বল অংশ থাকে। ইহার বর্ণ দেখিয়া পতঙ্গ আসিয়া উহার উপরে বসে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছলাইয়া কলসের মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন কলসীর মধ্য হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় এবং ঐ রসে পোকা হজম হইয়া যায়।

আরও অনেক প্রকার পতঙ্গভুক উদ্ভিদ অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। গাছের জীবনে মূলের প্রধান কাজ কি?

২। কয়েক প্রকার অস্থানিক মূলের পরিচয় ও কাজ বর্ণনা কর।

৩। সাধারণ গাছের কাণ্ড গাছের জন্য কি করে?

৪। ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড কাহাকে বলে? কয়েকটি ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের উদাহরণ দাও।

৫। কয়েকটি রূপান্তরিত কাণ্ডের উদাহরণ ও তাহাদের কাজের পরিচয় দাও।

৬। পাতাকে গাছের রান্নাঘর বলা হয় কেন ভালরূপে বুঝাইয়া দাও।

৭। গাছের পাতার প্রধান কাজগুলি বর্ণনা কর।

৮। একটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পরিচয় দাও।

৯। "গাছ না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না" একথা কতদূর সত্য তাহা বুঝাইয়া বল।

দ্বিতীয় পাঠ

ফুলের বিভিন্ন অংশ ও ফুলের কাজ

জবা, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা

ফুলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য নানা প্রকার ফুল লইয়া উহার অংশগুলি পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

জবাফুল পরীক্ষা—একটি জবাফুল লইয়া পরীক্ষা কর। ফুলটি যেখানে বোঁটার সঙ্গে লাগানো আছে, সেইখানে কয়েকটি সরু সরু সবুজ পাপড়ির মত জিনিস আছে দেখিতে পাইবে। ঐগুলিকে **উপবৃতি** বলে।

সকল ফুলের উপবৃতি থাকে না, আর উপবৃতির খুব প্রয়োজনও নাই। কিন্তু মনে রাখিও কোন কোন ফুলের ইহা একটা অংশ বটে।

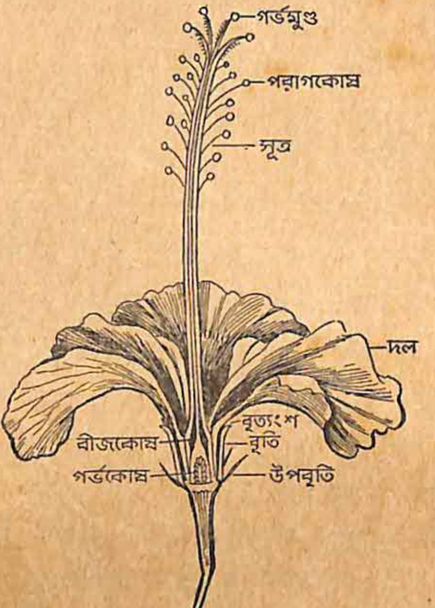
উপবৃতির উপরে একটি ছোট সবুজ খোলসের মত জিনিস দেখিতে পাইবে। ইহাকে **বৃতি** বলে। বৃতির উপরের অংশ পাপড়ির মত পাঁচ ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে—ঐ পাপড়ির মত অংশগুলিকে **বৃত্যংশ** বলে।

বৃতির মধ্যে ফুলের পাপড়িগুলি কুঁড়ি অবস্থায় আবদ্ধ থাকে। ইহাতে রোদ ও বৃষ্টিতে ফুলের কুঁড়ির কচি পাপড়িগুলি নষ্ট হইতে পারে না। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলকে রক্ষা করাই বৃতির কাজ।

ফুলের পাপড়িকে **দল**ও বলা যায়। সবগুলি পাপড়িকে একত্রে **দলচক্র** বলে।

জবাফুলের দলগুলির মাঝখানে একটি নরম ডাঁটার মত জিনিস আছে। উহাতে **পুংকেশর চক্র** ও গর্ভকেশর চক্র একত্র মিলিত আছে। কিন্তু সকল ফুলে ঐ দুই চক্র একত্র মিলিত থাকে না।

সুতরাং ফুলের প্রধান অংশগুলিকে চারিটি চক্রে ভাগ করা যায়, যথা—**বৃতিচক্র, দলচক্র, পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র।** এইবার সাবধানে ফুলটির বৃতি ছিঁড়িয়া ফেল ও পরে এক এক করিয়া পাপড়িগুলিও ছিঁড়িয়া ফেল। এখন বোঁটার সঙ্গে ফুলের মাঝখানের শীষ বা ডাঁটাটি শুধু থাকিয়া যাইবে।



জবাফুলের বিভিন্ন অংশ

শীষটির উপর দিকের শেষ প্রান্তে কয়েকটি বড় গুটির মত জিনিস দেখিতে পাইবে। কিন্তু উহার নীচে পাশের দিকে আরও কতকগুলি ছোট ছোট গুটির মত জিনিস রহিয়াছে। ঐগুলি সুতার মত সরু এক প্রকার জিনিসের দ্বারা দণ্ডের সঙ্গে লাগানো আছে। পাশের ঐ ছোট ছোট

গুটিগুলির গায়ে হাত দিলে হাতে ফুলের **রেণু** বা **পরাগ** লাগিয়া যায়। ঐ গুটিগুলির মধ্যে পরাগ থাকে বলিয়া ঐগুলিকে **পরাগকোষ** বলে।

শীর্ষটির বাহিরের লাল পর্দাটুকু অতি সাবধানে আগাগোড়া সরাইয়া ফেল। এখন ভিতরে সাদা শীর্ষটি আগাগোড়া দেখা যাইবে। ইহাকে **গর্ভকেশর** বলে।

গর্ভকেশরের নীচের অংশটুকু অপর অংশের তুলনায় একটু মোটা ; উহাকে **বীজকোষ** বলে।

গর্ভকেশর বা সাদা শীর্ষটি নিরেট দণ্ড নয়, উহা ফাঁপা নল,—ইহাকে **গর্ভদণ্ড** বলে। গর্ভদণ্ডের উপরের গুটির মত জিনিসগুলিকে **গর্ভমুণ্ড** বলে।

পরাগকোষগুলি সূতার মত অংশ দ্বারা দণ্ডের বাহিরের লাল পর্দার মত জিনিসে লাগানো থাকে। দণ্ডের চারিদিকের ঐ লাল পর্দাকে **পুংকেশর** বলে এবং সূতার মত অংশগুলিকে **সূত্র** বলে।

এইবার বীজকোষটিকে ধারালো ছুরি দিয়া কাটিয়া দুইভাগ কর। দেখিবে বীজকোষের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ডিমের মত জিনিস আছে। ঐগুলিকে **ডিম্বকোষ** বলে।

সুতরাং জবাফুলের পুংকেশর চক্রের তিনটি অংশ আছে, যথা—দণ্ডের চারিদিকে লাল বর্ণের পর্দা, সূত্র ও পরাগকোষ ; ঐ পরাগ-কোষেই পরাগ বা রেণু থাকে।

জবাফুলের পুংকেশর গর্ভদণ্ডের চারিদিকে পর্দার মত লাগিয়া থাকে ; অন্য ফুলে ঐগুলি সাধারণত পৃথকই থাকে।

গর্ভকেশর চক্রেরও তিনটি অংশ আছে, যথা—বীজকোষ, গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড ; বীজকোষের মধ্যে ডিম্বকোষ থাকে।

এখন ফুলের প্রধান অংশগুলির কাজ বুঝিতে পারিবে।

পরাগ মিলন

পরাগ সংযোগ—পুংকেশর হইতে ফুলের রেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে ফুল হইতে ফল জন্মে। পরাগ সংযোগ না হইলে কোনও ফুল হইতে ফল হয় না।

পরাগ সংযোগ নানা উপায়ে ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ যখন এক ফুল হইতে অন্য ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু পান করে তখন ইহাদের গায়ে ও পায়ে অনেক পরাগ লাগিয়া যায় এবং ইহাদের শরীর হইতে আবার ফুলের গর্ভমুণ্ডে ঐ পরাগ লাগিয়া যায়। ইহাতেই পরাগ সংযোগ ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ ফুলেই ঐ উপায়ে পরাগ সংযোগ ঘটে। বায়ু দ্বারাও অনেক ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

পেঁপের যে গাছে ছোট ছোট ফুল ফোটে সেই গাছে পেঁপে ধরে না। ঐ ফুল সম্পূর্ণ ফুল নহে, উহাতে গর্ভকেশর থাকে না। যে পেঁপে গাছে ফল ধরে সেই গাছে অন্য রকম ফুল ফোটে, উহাতে পুংকেশর থাকে না, শুধু গর্ভকেশর থাকে।

পেঁপের পরাগ বা রেণু খুবই হাল্কা ; ঐ রেণু বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া পেঁপের স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে পরাগ সংযোগ ঘটে।

কিন্তু গর্ভমুণ্ডে রেণু আসিয়া লাগিলেই পরাগ সংযোগ সম্পূর্ণ হয় না। ফুলের রেণু গর্ভমুণ্ডে পড়িলে ঐ রেণু হইতে খুব সরু সরু সুতার মত একটি লেজ বাহির হইয়া গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া নীচে নামে। ঐ লেজ বীজকোষে আসিয়া ডিম্বকোষকে স্পর্শ করিলে পরাগ সংযোগ সম্পূর্ণ হয় এধং ডিম্বকোষগুলি ধীরে ধীরে বীজে পরিণত হয়, আর বীজকোষটি তখন ফলে পরিণত হয়।

সুতরাং ফুলের কাজ ফল সৃষ্টি করা।

কিন্তু দলচক্র বা পাপড়িগুলি কি করে? দলচক্র বা পাপড়িগুলি ইহাদের বর্ণে ও গন্ধে মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ইহাই দলের কাজ।

বৃতিচক্র ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় রক্ষা করে। দলচক্র পরাগ সংযোগ ঘটাইবার জন্য মৌমাছি বা অন্য পতঙ্গকে বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট করে। পুংকেশরচক্র পরাগ বা রেণু যোগায়, গর্ভকেশরচক্রের এক অংশই ফলে পরিণত হয়। ফলে যে বীজ থাকে তাহা হইতে আবার গাছ জন্মে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, ফুল গাছের বংশ রক্ষা করিতে সাহায্য করে।

যে সকল ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে না, সেই সকল ফুল হইতে ফল হয় না। তোমরা যে জবাফুল পরীক্ষা করিলে উহা ঐ প্রকার ফুল। ঐরূপ গাছের কান্ড হইতে নূতন গাছ জন্মে।

আবার ধুতুরা, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি গাছে প্রত্যেক ফুল হইতে একটি করিয়া ফল ধরে। ঐ সকল ফুলে পরাগ সংযোগ না ঘটিলে ফল ধরিবে না।

যে সকল ফুলে পুংকেশরচক্র এবং গর্ভকেশরচক্র থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। যে সকল ফুলে পুংকেশরচক্র থাকে কিন্তু গর্ভকেশরচক্র থাকে না তাহাকে পুংপুষ্প ও যে ফুলে গর্ভকেশরচক্র থাকে কিন্তু পুংকেশরচক্র থাকে না তাহাকে স্ত্রীপুষ্প বলে।

ধুতুরা, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুল।

অপরাজিতা ফুলও সম্পূর্ণ ফুল। কিন্তু ইহার সবগুলি পাপড়ি সমান নয়। ইহার দশটি পুংকেশর আছে। ইহাকে **অসমদল সম্পূর্ণ ফুল** বলে।

ধুতুরা, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুল লইয়া পরীক্ষা করিবে এবং ইহাদের

বিভিন্ন অংশ পৃথক করিয়া চিনিতে শিখিবে। দেখিবে অপরাজিতা এবং ধুতুরা ফুলের পুংকেশর ও গর্ভকেশর পৃথক—জবা ফুলের মত সংযুক্ত নহে।

লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙে প্রভৃতি গাছ প্রায় সব বাড়িতেই ফলানো হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবে ঐ গাছগুলিতে দুই রকম ফুল ফোটে —এক রকম ফুলে শুধু গর্ভ-কেশর থাকে, অন্য রকম ফুলে শুধু পুংকেশর থাকে, অর্থাৎ একটি স্ত্রীপুষ্প অপরটি পুং-পুষ্প। যেটিতে ফলের কলি দেখা যায় উহাই স্ত্রীপুষ্প, অপরটি পুংপুষ্প। ফলের কলিটি প্রকৃতপক্ষে গর্ভদণ্ডের অংশ—উহা বীজকোষ।



অপরাজিতা ফুল ও ইহার অংশ

এখন তোমরা বুঝিবে যে ফুলের কাজ গাছের বংশ রক্ষায় সাহায্য করা, কারণ ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয়, ঐ ফলে বীজ থাকে—বীজ হইতেই আবার গাছ হয়।

মনে রাখিও কোন কোন স্থলে কাণ্ড ও পাতা দ্বারাও গাছের বংশ রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল গাছে ফুল ফোটে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজ হইতে গাছ জন্মে—অর্থাৎ ফুলই গাছকে বংশ রক্ষা করিতে সাহায্য করে।

ফুলসংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহ-পুস্তিকা প্রস্তুতি

ফুল সংরক্ষণ—বৎসরের সকল সময় সব রকম ফুল পাওয়া যায় না, কখন কখন নূতন স্থানে গেলে নূতন ফুলও চোখে পড়ে। কিন্তু ফুল

যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেও ফুলের পাপড়ি শুকাইয়া কুঁচকাইয়া যায় এবং কিছুদিন পর ঐ শুকনা ফুল দেখিয়া, তাজা ফুলটি কিরূপ ছিল বোঝা যায় না।

ফুল সংরক্ষণ করিবার এক সহজ উপায় তোমাদিগকে বলিতেছি।

দুইখানি বড় ব্লটিং কাগজ সংগ্রহ কর। একখানার উপর ফুলটির পাপড়িগুলি পাতিয়া রাখিয়া অপরখানা উহার উপরে রাখ। এইবার কয়েকখানা ভারী বই ইহার উপর চাপাইয়া রাখ। শীতকালে পাঁচ সাত দিন ও বর্ষাকালে দশ বার দিন পর উপরের বই ও ব্লটিং কাগজ সরাইয়া দেখিবে ফুলটির পাপড়ি ও অন্যান্য অংশ শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু কুঁচকাইয়া যায় নাই। ফুলের বিভিন্ন অংশ পৃথক করিয়া ঐভাবে শুকাইয়া লইলে প্রত্যেক অংশ পৃথকভাবে শুকাইয়া থাকিবে।

ফুলের সংগ্রহ-পুস্তক—ফুল শুকাইয়া গেলে উহা একখানা খাতার পাতায় তুঁতে মিশ্রিত আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখিবে এবং ঐ খাতার পাতায় ডি, ডি, টি, পাউডার বা ন্যাপথেলিনের গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিবে, তাহা হইলে আর ঐগুলি পোকায় খাইবে না।

দেখিয়া শুনিয়া ঐভাবে অনেকগুলি ফুল শুকাইয়া খাতার বিভিন্ন পাতায় আঁটিয়া রাখিবে। যে পাতায় কোন ফুল বা ফুলের অংশ আঁটিয়া রাখিবে তাহার দুই দিকেই দুইখানা পাতা খালি রাখিবে।

অনুশীলনী

১। ফুলের বিভিন্ন অংশগুলির নাম বল। একটি ফুল আঁকিয়া উহার বিভিন্ন অংশগুলি ছবিতে চিহ্নিত কর।

২। বৃতি ও দলচক্রের কাজ কি?

৩। পুংকেশর ও গর্ভকেশরের কাজ কি?

৪। পরাগমিলন কিভাবে সম্পন্ন হয়?

৫। অপরাজিতার কয়টি পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে?

৬। ফুল কিভাবে সহজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায় বল।

তৃতীয় পাঠ

বৃক্ষের শাখা, ত্বক প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

গাছ ও গাছের শাখাবিন্যাস ও প্রশাখা পরীক্ষা

তোমরা জান সকল গাছের শাখা থাকে না। তাল, নারিকেল, আখ প্রভৃতি ঐরূপ গাছ। কিন্তু যে সকল গাছের শাখা থাকে সেইগুলির শাখাবিন্যাস—অর্থাৎ শাখা বাহির হওয়ার রীতি একরূপ নয়।

দেবদারু প্রভৃতি লম্বা গাছগুলির নীচের দিকে সাধারণতঃ বেশী শাখা থাকে না, উপরে সরু সরু শাখা থাকে।

আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের শাখা বাহির হওয়ার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অনেক গাছের বেশ নীচেই বড় শাখা থাকে আবার কোন কোন গাছের কাণ্ডের অনেক উপর হইতে শাখা বাহির হয়।

ঝাউ প্রভৃতি যে সব গাছ ঝোপের আকৃতি পায় উহাদের কাণ্ডের নীচে চারিদিকে প্রায় সমান লম্বা শাখা বাহির হয়, কাণ্ডের উপর দিকে ক্রমশঃ সব দিকের শাখাই ছোট হইয়া যায়। সেই জন্য ঐ গাছগুলি দেখিতে সুন্দর হয়।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া দেখিও, যে গাছের কাণ্ডে পর পর শাখা বাহির হয় তাহার একদিকে একটা শাখা বাহির হইলে পরের শাখাটা বিপরিত দিকে বাহির হয়। ইহাতে গাছ একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে না।

ইহা ছাড়া আরও এক কারণ আছে। গাছের ডাল হইতে আবার ছোট ডাল বা প্রশাখা বাহির হয়। ঐ প্রশাখায় পাতা থাকে; কিন্তু কাণ্ড পাতাকে এমন ভাবে সাজাইতে চায় যেন সব পাতায় সূর্য কিরণ পড়িতে

পারে। এই জন্যই এক ডালের নীচে আর এক ডাল বাহির হইয়া সমান্তরাল হইয়া চলে না।

বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পরীক্ষা

নানা রকম গাছের ডালপালা দেখিয়া কোন্ গাছের ডাল কিরূপ থাকে তাহা লক্ষ্য করিবে।

ছোট অবস্থায় গাছের ডালের রং সাধারণতঃ সবুজ থাকে। ডাল বড় হইলে উহা কাণ্ডের রং ধরে। পেয়ারা গাছের কচি ডালের গঠন ও বর্ণ বড় ডালের গঠন ও বর্ণের সহিত তুলনা করিলেই প্রভেদ বুঝিতে পারিবে।

ফুল ও পাতা দেখিয়া গাছ চেনা সহজ, ডাল বা কাণ্ড দেখিয়া গাছ চিনিতে হইলে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কতকগুলি গাছ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া পরে উহাদের ডাল দেখিয়া ঐগুলি চিনিতে চেষ্টা করিবে।

গাছের ডাল জলে ডুবাইয়া পরীক্ষা করা

ফুল ফুটিবার আগে ফুলের কলি সকলেই দেখিয়াছ, পরে ফুল ফুটিয়া যাওয়ার পর ফুলও দেখিয়াছ। কিন্তু কখনও ফুলকে ফুটিতে দেখিয়াছ কি? রাত্রিকালেই বেশির ভাগ ফুল ফুটে, কিন্তু রাত্রিকালে কলি হইতে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ফুল ফুটিয়া উঠে তাহা দেখা সম্ভব হয় না।

এক কাজ কর। একটা গন্ধরাজ গাছে ফুলের কলির প্রতি লক্ষ্য রাখ। যেদিন বুঝিবে যে পর দিন ঐ কলি হইতে ফুল ফুটিবে তখন ফুলের কলিশুদ্ধ ডালটি বিকালবেলা কাটিয়া আন।

ডালের গোড়াটা বোতলের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ফুলটির প্রতি লক্ষ্য রাখ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখিবে ক্রমশঃ পাপড়িগুলি মেলিয়া কলি হইতে একটি ফুল হইয়া গেল। দেখিবে সব পাপড়িই সমানভাবে ক্রমশঃ

খুলিতে থাকে—একটি পাপড়ি সম্পূর্ণ মেলিয়া যাওয়ার পর অন্য পাপড়ি মেলিতে আরম্ভ করে না।



গাছের ডাল জলে ডুবাইয়া মূলোদ্গম পরীক্ষা

পাতাবাহার প্রভৃতি গাছের ডাল আনিয়া ঐরূপ বোতলের জলে কিছুদিন ডুবাইয়া রাখিলে দেখিবে ধীরে ধীরে ডাল হইতে শিকড় বাহির হইতেছে। ঐ শিকড় ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। মূল হইতে যে মূলরোম বাহির হয় তাহা ঐ সময়ে দেখা যায়। জল শোষণ করিয়া গাছ কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

গাছের ত্বক ও শাখা মুকুলের পরীক্ষা

সকল গাছের ত্বক অর্থাৎ ছালের বাহিরের দিকটা এক রকম নয়, কোন কোন গাছের ত্বক মসৃণ, কোন কোন গাছের ত্বক মসৃণ নহে।

আখ গাছের ত্বকে দুইটি গাঁইটের মধ্যের অংশ মসৃণ, কিন্তু আম বা কাঁটাল গাছের ত্বক মসৃণ নয়, আবার সজিনা ও বকফুল গাছের ত্বক ফাটাফাটা।

কাণ্ডের মধ্যে গাঁইট থাকে, কিন্তু সকল গাছের কাণ্ডে গাঁইট স্পষ্ট দেখা যায় না। গাঁইট হইতে পাশের দিকে মুকুল বাহির হইয়া বড় হইলে ঐগুলি শাখায় পরিণত হয়। যে গাছের শাখার মুকুল বাড়ে না সেই গাছের ডাল বা শাখা হয় না।

অনুশীলনী

১। গাছের ডালপালা সাধারণতঃ কিভাবে বিন্যস্ত হয় বল।

২। বোতলের জলে ডাল রাখিয়া কখনও পরীক্ষা করিয়াছ কি? কি ডাল রাখিয়াছিলে ও কি দেখিতে পাইলে বল।

৩। গাছের ত্বক বলিলে কি বোঝা যায়? তোমার পরিচিত দুইটি গাছের ত্বকের বিশেষত্ব বর্ণনা কর।

৪। গাছের শাখামুকুল কি? এমন কয়েকটি গাছের নাম কর যাহাদের শাখা-মুকুল বাড়ে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফসল কাটার পদ্ধতি—উহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

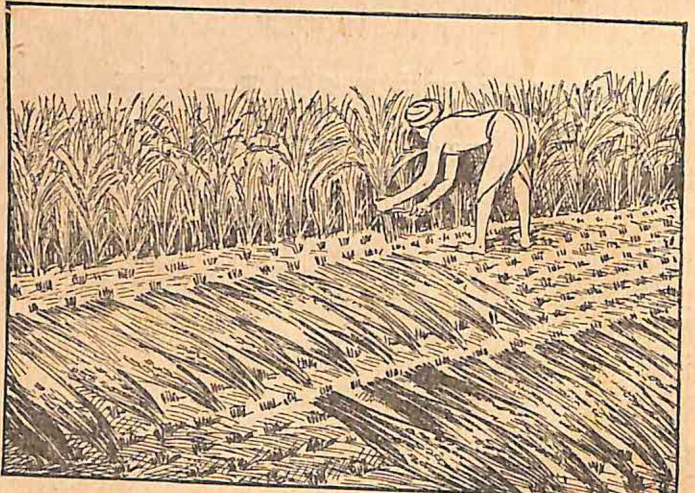
ধানের ফসল—ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য-শস্য। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই আমন ধানের চাষ করা হয়। ঐ ধান কার্তিক মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ করে এবং পৌষ মাসে কোন জমির ধানই পাকিতে বাকী থাকে না।

ধান পাকিলে কৃষকের মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। সারা বৎসরের পরিশ্রমের পুরস্কার তাহারা ঐ সময়ে পায়। কিন্তু ধান কাটিয়া ফসল ঘরে তোলা খুব সহজ কাজ নহে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কৃষকগণ মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনে।

ধান কাটার পদ্ধতি—ভোর হইতে না হইতেই ইহারা কাস্তে হাতে লইয়া মাঠে চলিয়া যায়; দড়ি, বাঁক প্রভৃতিও সঙ্গে নেয়। মাঠে পৌঁছিয়া তাহারা আর সময় নষ্ট করে না, কারণ বৎসরের ঐ ঋতুতে দিন ছোট, রাত বড়; দিনের আলোর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে ইহারা ত্রুটি করে না।

বাঁ হাতে গোছা গোছা ধান গাছ ধরিয়া ডান হাতে উহারা গাছের গোড়ায় কাস্তে চালায়।

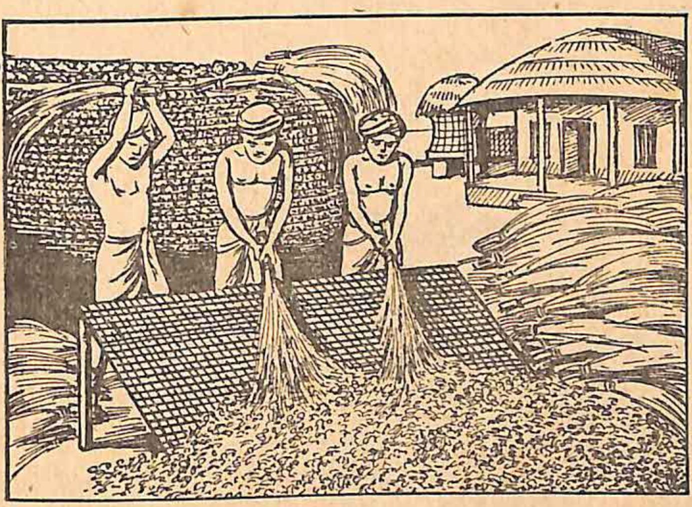
ধানের গুছিগুলি কাটা হইলে ঐগুলি জমিতেই ৩।৪ গুছি একত্র করিয়া পর পর সমান্তরাল ভাবে বিছাইয়া রাখা হয়। ঐ অবস্থায় জমিতে ২।১ দিন পড়িয়া থাকিয়া ধান গাছগুলি শুকাইতে থাকে। রাত্রে শিশির জমিয়া গাছগুলি ভিজিয়া যায়, এবং ভিজা অবস্থায় সকালবেলা ঐগুলি লইয়া এক একটি আঁটি বাঁধা হয়। শিশির-ভেজা অবস্থায় ধানের আঁটি বাঁধিলে ভাল ভাবে আঁটি বাঁধা যায় ও বিচালি ভাল থাকে।



ধান কাটা

কোন কোন জমিতে একাধিক লোক কাজ করে এবং কয়েকজন শুধু ধানই কাটিয়া চলে, অন্যেরা আঁটি বাঁধা এবং খামারে ধান বহিয়া আনা প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। ধান কাটিবার সময় বাংলাদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না। সেই জন্য ধানের আঁটিগুলি আনিয়া খোলা খামারে গাদা করিয়া রাখা হয়। খামারে থাকিয়া ধান শুকাইয়া যায়। তখন খামারে ধান ঝাড়াই করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ধান ঝাড়াই-এর জন্য খামারে আগড় থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের আগড় তৈরী হইয়া থাকে। বাঁশের বাঁখারি দিয়া বুনট লাগাইয়া আগড় তৈরী করা হয়। উহাকে দুইটি খোঁটার উপর একটু কাত ভাবে রাখিয়া ধান ঝাড়া হয়।



ধান ঝাড়া

এইভাবে শুক্‌না ধানগাছ হইতে ধান পৃথক হইয়া গেলে ঐ ধান-গাছের আঁটিকে বিচালি বা খড় বলে।

পাটায় বা আগড়ে ধান আছড়াইবার সময় খণ্ড খণ্ড লম্বা শীষ মাঝে মাঝে পৃথক হইয়া যায়। ঐ ভাঙা শীষগুলির সঙ্গে যে ধান লাগিয়া থাকে তাহা পাইবার জন্য ঐগুলি জড়ো করিয়া রাখা হয়। ঐরূপ ধানের শীষ যথেষ্ট জমিয়া গেলে ঐগুলিকে মাটিতে বিছাইয়া ইহার উপর দিয়া গরুকে ক্রমাগত তাড়াইয়া ঘোরান হইয়া থাকে। গরু পা দিয়া মাড়াইয়া গেলে শীষ হইতে ধানগুলি পৃথক হইয়া যায়। ইহাকে **ধান মাড়াই** বলে।

ঝাড়াই ও মাড়াই-এর পর ধান ঝাড়িয়া মরাই বা গোলায় তুলিয়া রাখিতে হয়।

মরাই-এ ধান সংরক্ষণ—মরাই প্রস্তুত করিবার জন্য কৃষকরা খড় দিয়া ২।৩ ইঞ্চি প্রশস্ত ও পুরু খড়ের বিনুনী পাকাইয়া **বড়্** তৈরী করিয়া রাখে। এইরূপ খড়ের বড়্গুলি ২০।২৫ হাত হইতে ৫০।৬০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।



ধান সংরক্ষণ—গোলা বা করুই ও মরাই

মাচান বাঁধিয়া খড় পাতিয়া লইয়া ঐ খড়ের উপর একটি বিনুনী বৃত্তাকারে বসানো হয়, যাহাতে উহার পাশের দিক খাড়া থাকে। কিছু ধান রাখিয়া বিনুনীর পাশের দিক যতটা উঁচু হইল ততটা পর্যন্ত ধান দিয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হয়। পর পর এইভাবে চলিয়া ক্রমশঃ উঁচু মরাই প্রস্তুত হইতে থাকে। ধান রাখা শেষ হইয়া গেলে ইহার উপর খড়ের চাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মরাই হইতে ধান খুলিতে হইলে মই

দিয়া উপরে উঠিয়া ক্রমশঃ বিনুনী খুলিয়া ধান বাহির করিয়া লইতে হইবে। বেশী ধান বেশী দিন মজুত রাখিবার জন্য ঐ ব্যবস্থা করা হয়।

অল্প ধান রাখিবার জন্য **করুই** বা **গোলা** নির্মাণ করা হয়। বাঁখারি দ্বারা বুনিয়া একটি মাচানের উপর চারিদিকে গোল করিয়া বেড়া দিয়া উহার ভিতর দিক ও তলাটা কাদামাটি দিয়া পুরু করিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। করুই বা গোলার উপর দিকে একটি ছোট দরজা রাখা হয় এবং ঐ দরজার ভিতর দিয়া ধান ঢালা বা বাহির করা হইয়া থাকে।

পাটের ফসল

পাট বাংলাদেশের এক বিশেষ সম্পদ। এত ভাল পাট পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোন দেশে জন্মে না।

পাট গাছে ভাদ্র মাসে ফুল ও পরে ফল ধরে। ঐ সময় গাছ কাটিতে হয়। পাট গাছ কাটিয়া জমিতে ফেলিয়া রাখা হয় এবং পাঁচ সাত দিন পরে পাতাগুলি ঝরিয়া গেলে আঁটি বাঁধা হয়। ঐ আঁটিগুলি জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। প্রায় পনর কুড়ি দিন পরে পাট পচিয়া যায়। তখন আঁটিগুলির গোড়াকে একটা ছোট মুগুর দিয়া ঘা মারিয়া থেঁতলাইয়া লইয়া ছালগুলি পাঁকাটি হইতে ছাড়াইয়া পাট বাহির করা হয়। পাট গাছের ছালই পাট। পাট পাঁকাটি হইতে ছাড়ানো হইলে জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া শুকাইতে হয়। পাট শুকাইবার পর কৃষকরা ঐগুলি দ্বারা গাঁইট বাঁধে।

পাট হইতে সাধারণ কাজের জন্য নানা রকম দড়ি পাকানো হয়। পাট হইতে চট, বস্তা প্রভৃতি তৈরী হয়। ঐ চট ও বস্তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া যায়। সেই কারণে বাংলাদেশ হইতে বহু চট ও বস্তা প্রতি বৎসর বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

অনুশীলনী

১। ধানের ফসল কিভাবে কাটা ও সংগ্রহ করা হয় বল। বেশী ধান লোকে কিভাবে মজুত রাখে?

২। পাট কি জিনিস? উহা কিভাবে পাওয়া যায়? পাটের ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান বল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রজাপতি, গুটিপোকা, মশা, ব্যাঙ, পিপীলিকা ও মৌমাছির জীবনকথা

প্রজাপতি, বোল্‌তা, পিঁপড়া, উঁই প্রভৃতিকে কীট-পতঙ্গ বলা হয়। ইহাদের শরীরে তিনটি অংশ থাকে—মাথা, বুক ও পেট।

কীটের পাখা থাকে না, পতঙ্গের পাখা থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই ছয়খানা পা, তিনখানা তিনখানা করিয়া বুকের দুইধারে লাগানো থাকে। পতঙ্গের পাখাও পতঙ্গের বুকের দুই দিকে লাগানো থাকে।

তসর, এণ্ডি, সিল্ক প্রভৃতিকে এক কথায় রেশম বলা হয়। রেশমের প্রজাপতির গুটি হইতে রেশমের সুতা পাওয়া যায়।

রেশম-প্রজাপতির জীবনবৃত্তান্ত

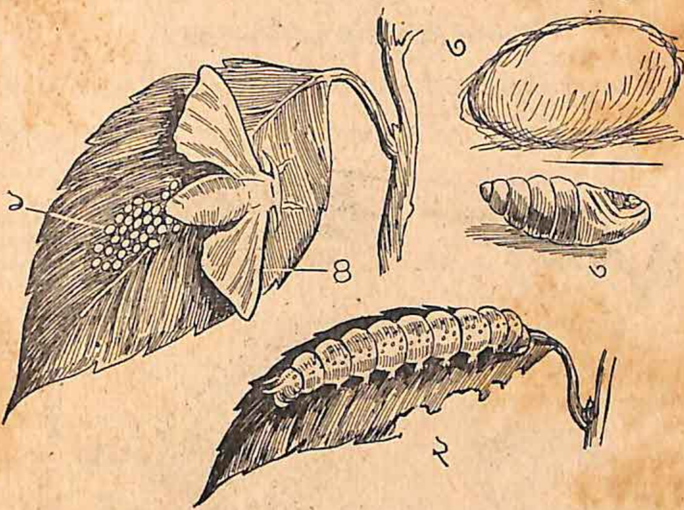
অধিকাংশ রেশমের প্রজাপতি এরণ্ড (বা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা) ও তুঁত গাছের পাতা খাইয়া থাকে।

স্ত্রী-প্রজাপতি উপযুক্ত পাতার উপর ডিম পাড়িয়া রাখে। প্রায় ১০।১২ দিন পর ঐ ডিম ফুটিলে কালো কালো একপ্রকার পোকা বাহির হয়। ঐগুলিকে **শূককীট** বলে।

শূককীটকে তখন তাহার উপযুক্ত খাদ্য অর্থাৎ তুঁত বা ভেরেণ্ডা গাছের কচি পাতা খাইতে দিতে হয়। ঐ পাতা খাইয়া শূককীটগুলি

বেশ তাড়াতাড়ি বড় হইতে থাকে। তাহাদের খাওয়ার পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রায় ১৫ দিন ঐভাবে খুব বেশী বেশী খাওয়ার পর ইহারা খাওয়া বন্ধ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ৪।৫ বার খোলস বদলায়।

খাওয়া বন্ধ করিলে শূককীটগুলিকে খড় বিছাইয়া ধামায় রাখিতে হয়। তখন উহাদের মুখ হইতে এক প্রকার সূতার মত জিনিস বাহির



রেশম প্রজাপতির রূপান্তর—১—ডিম, ২—শূককীট, ৩—পুত্তলী, ৪—প্রজাপতি

হইতে থাকে এবং নিজেরা নিজেদের চারিদিকে ঐ সূতা দ্বারা এক একটি গুটি তৈরী করে। ধীরে ধীরে ইহারা গুটির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়। তখন আর ইহাদের খাওয়ার আবশ্যক হয় না। ঐ অবস্থায় ইহাদিগকে **মূককীট** বলে। গুটির মধ্যে চুপ করিয়া থাকা অবস্থায় ইহাদের শরীরের গঠন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। ইহাদের শরীর ঐ সময় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া মাথা, পেট ও বুক দেখা দেয় আর বুকের অংশ হইতে ছয়খানি পা ও এক জোড়া পাখা বাহির হয়।

প্রায় তিন সপ্তাহ গুটির মধ্যে থাকিবার পর গুটি কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ রেশমের প্রজাপতি বাহিরে চলিয়া আসে। ২।১ দিনের মধ্যেই স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি বহু ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়।

গুটি হইতে যাহারা সূতা প্রস্তুত করে তাহারা গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া আসিবার আগেই গুটিগুলি সিদ্ধ করিয়া লয়।

সাধারণ প্রজাপতির জীবনবৃত্তান্ত

সাধারণ প্রজাপতিকে কেহ পালন করে না। ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতির পাখা হয় নানা বিচিত্র বর্ণের।



সাধারণ প্রজাপতির রূপান্তর—১—ডিম, ২—শূককীট, ৩—পুত্তলী, ৪—প্রজাপতি

স্ত্রী-প্রজাপতি উপযুক্ত গাছের পাতার উল্টা দিকের উপর ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বা শূককীট বাহির হইয়াই ঐ পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সাধারণ প্রজাপতির শূককীট নানা রকমের হয়।

কোন কোন প্রজাপতির শূককীটের গায়ে শুঁয়া থাকে আবার কতকগুলির গায়ে শুঁয়া থাকে না।

ইহারা প্রায় ১৪।১৫ দিন খুব বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে খোলসের ভিতর মূককীটে পরিণত হয়। ঐ খোলসটি পাতলা পর্দার মত। যথাসময়ে খোলস কাটিয়া প্রজাপতি বাহিরে চলিয়া আসে। ইহারা কছু দিন বাঁচিয়া থাকে এবং ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুলের উপর বসিবার কালে সাধারণতঃ ইহারা পাখা দুইটি উঁচু করিয়া রাখে।

মশার জীবন কথা

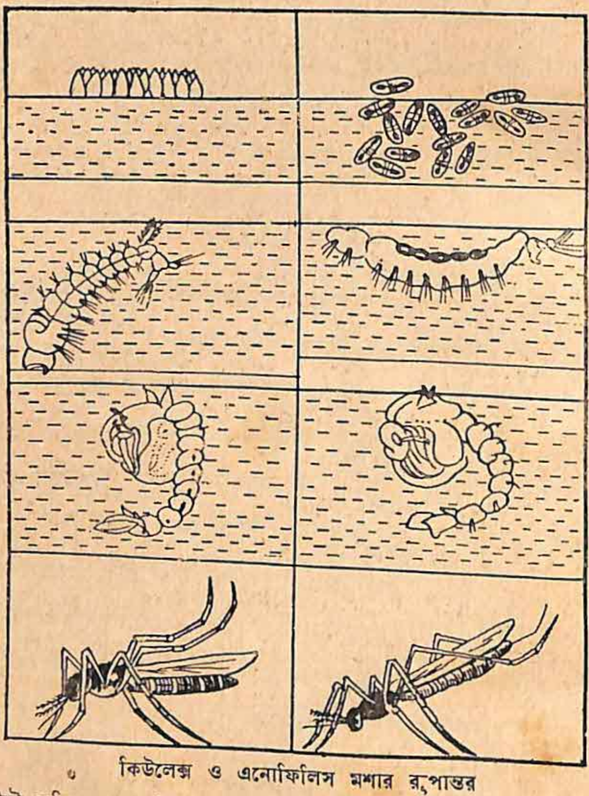
আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া একটি মারাত্মক রোগ। প্রতি বৎসর এই রোগে আমাদের দেশে অনেক লোক মারা যায়।

এ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা ঐ রোগের জীবাণু ছড়ায়। একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া যখন ঐ মশা অন্য কোনও সুস্থ লোককে কামড়ায় তখন ঐ সুস্থ লোকটির শরীরে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ঢুকিয়া যায়। ইহাতে সুস্থ লোকটিরও ম্যালেরিয়া রোগ হইতে পারে।

কিন্তু আমরা যত মশা দেখি তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এ্যানোফিলিস নহে ; **কিউলেক্স** নামে আর একজাতীয় মশা আছে, ইহাদের সংখ্যাই বেশী। এ্যানোফিলিস মশা দেওয়ালে বসিবার কালে পিছন দিকটা উঁচু করিয়া বসে আর কিউলেক্স বসে সমান হইয়া। কাজেই ইহাদের বসিবার ধরণ দেখিয়া ইহাদিগকে চেনা যায়।

মশা জলে ডিম পাড়ে। এ্যানোফিলিসের ডিমগুলি পৃথক পৃথক থাকে আর কিউলেক্সের ডিম অনেকগুলি একসঙ্গে জলে ভাসিতে থাকে। কয়েক দিন পর ডিম ফুটিয়া শূককীট বাহির হয়। ইহারা জলের ময়লা, জীবাণু প্রভৃতি খাইয়া ক্রমশঃ বড় হয়।

ইহাদের শরীরের পিছন দিকে একটা শ্বাসনল থাকে। ইহারা মাঝে মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে ও শ্বাসনলটি উপরে তুলিয়া ধরিয়া বায়ু টানিয়া আবার নীচে চলিয়া যায়। কিউলেক্সের শূককীট কেবল লেজের



কিউলেক্স ও এনোফিলিস মশার রূপান্তর

দিকটাই তুলিয়া ধরে কিন্তু এ্যানোফিলিসের শূককীট শ্বাস টানিবার জন্য জলের উপর সমান হইয়া ভাসিয়া উঠে।

৫।৭ দিনের মধ্যেই ইহাদের শূককীটগুলির মাথায় একটা বড় খোলসের মত জিনিস তৈরী হয়। ২।৩ দিন পরেই ঐ খোলস কাটিয়া

মশা বাহির হয়। খোলসটা তখন জলের উপর ভাসিতে থাকে আর নূতন মশা ইহার উপর বসিয়া থাকে। কারণ খোলস হইতে বাহির হইয়াই উহারা উড়িয়া যাইতে পারে না ; পাখায় বায়ু লাগিয়া পাখা শক্ত হইলে তখন উহারা উড়িয়া যায়।

মনে রাখিও কিউলেক্স মশা ম্যালেরিয়া রোগের বাহন না হইলেও গোদ রোগের বাহন বটে। মশা যে রকমেরই হউক ইহাদের কামড়ে যন্ত্রণা হয়, এবং উহারা আমাদের শরীরের রক্ত শোষণ করিয়া লয়। সুতরাং মশা যাহাতে আমাদিগকে কামড়াইতে না পারে সেইজন্য যেখানে মশার উপদ্রব আছে সেখানে রাত্রে মশারি খাটাইয়া ঘুমানো উচিত।

ব্যাঙের জীবন কথা

ব্যাঙ উভচর প্রাণী—অর্থাৎ ইহারা জলেও থাকে আর স্থলেও থাকে। ইহাদের জন্ম হয় জলে, শৈশব অবস্থা ইহারা জলেই কাটায়। তখন শ্বাস টানিবার জন্য উহাদের মাছের মত ফুলকা থাকে। বড় হইলে ইহাদের ফুস্‌ফুস্‌ জন্মে ; তখন ইহারা ডাঙায় উঠিয়া আসে। এই জন্য ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলে।

গ্রীষ্মকালে ব্যাঙ খানা ডোবার জলে ডিম পাড়ে। ঐ ডিম জলে ভাসিতে থাকে আর ডিমের উপরে বাহির দিকে পিছলা একপ্রকার পদার্থ থাকে। ১৫।২০ দিন পর ডিম হইতে কালো কালো বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলির মাথার দিক গোল থাকে আর পিছনে একটি ছোট লেজ থাকে। ঐ বাচ্চাগুলিকে ব্যাঙাচি বলে। ব্যাঙাচিরা লেজ নাড়িয়া জলে সাঁতার কাটে। ঐ সময় উহারা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। জলে ডুবানো ঘাস-পাতা বা কাঠের উপর যে শেওলা জমে তাহা খাইয়া তখন উহারা বাঁচিয়া থাকে। প্রায় দুই সপ্তাহ পর ইহাদের চারিটি পা বাহির

হয়। কিন্তু সামনের দুই পা তখন পর্দায় ঢাকা থাকে বলিয়া দেখা যায় না। ফুস্‌ফুস্‌ শ্বাসকার্য চালাইবার উপযুক্ত হইলেই ইহাদের ফুল্‌কা নষ্ট হয় এবং সামনের পা দুইটি বাহির হইয়া আসে। চার পা বাহির হওয়ার পর ব্যাঙ জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিয়া আসে। তখনও কিন্তু



ব্যাঙের রূপান্তর—১—ডিম, ২—ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থা, ৩—ব্যাঙাচির শেষ অবস্থা, ৪—ব্যাঙের প্রথম অবস্থা, ৫—পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ

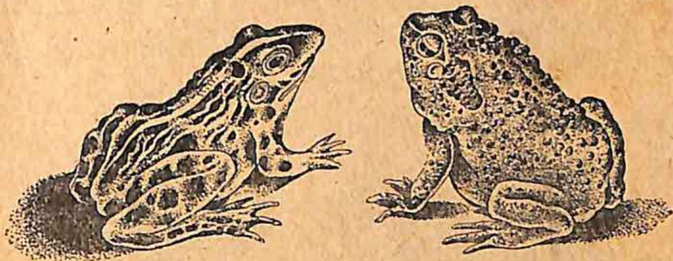
ইহাদের লেজটি থাকে। ব্যাঙ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লেজ ব্যাঙের শরীরেই শোষিত হইয়া যায়—খসিয়া পড়ে না।

ব্যাঙের পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে ও সামনের পায়ে চারিটি আঙুল থাকে।

বাংলা দেশে বহু প্রকার ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কুনো ব্যাঙ ঘরের কোণে আসিয়া আশ্রয় লয়। সোনা ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ মাঠের গর্তের মধ্যে থাকে ; বর্ষাকালে মাঠে জল দাঁড়াইলে ইহারা উপরে

উঠিয়া আসে এবং মনের আনন্দে গান জুড়িয়া দেয়। কুনো ব্যাঙের পিঠে বিষগ্রন্থি থাকে, উহা হইতে যে রস বাহির হয় তাহা বিষাক্ত।

ব্যাঙের জিহ্বা মুখের সামনের দিকে আটকানো, ভিতর দিকে খোলা। তাই ব্যাঙ জিহ্বা উল্টাইয়া বাহিরে আনে। ব্যাঙ জীবন্ত পোকা-মাকড় খাইয়া থাকে—মরা পোকা খায় না। কোন ছোট পোকাকে চলিতে



সোনা ব্যাঙ

কুনো ব্যাঙ

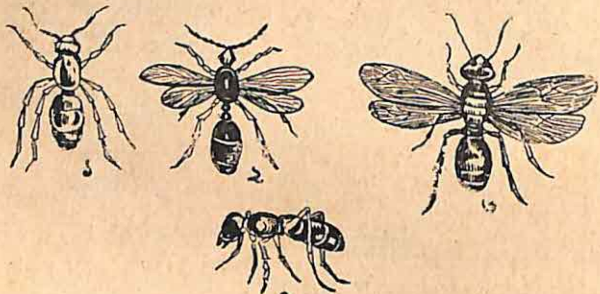
দেখিলে ব্যাঙ জিহ্বা উল্টাইয়া আনিয়া উহাকে স্পর্শ করে। জিহ্বার আঠালো রসে ঐ পোকা আটকাইয়া যায়; জিহ্বা ভিতরে টানিয়া লইলে পোকা একেবারে ব্যাঙের গলার মধ্যে চলিয়া যায়।

পিঁপড়ার জীবন-কথা

পিঁপড়া একপ্রকার কীট, ইহার শরীরে তিনটি অংশ—মাথা, বুক ও পেট। ইহার বুকের অংশ হইতে ছয়খানি পা বাহির হইয়াছে। ইহাদের জীবনে **ডিম, শূককীট, মূককীট** ও **পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়া** এই চারিটি অবস্থা আছে।

পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়া দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কিন্তু এক দলের সব পিঁপড়ার শরীরের গঠন, স্বভাব ও কাজ একরকম নহে।

পিঁপড়ার সারি দেখিলে একটু মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিও। দেখিবে সব পিঁপড়া আকারে সমান নয় এবং সবগুলি ঠিক একই গঠনেরও নহে। অধিকাংশ পিঁপড়া একই রকম হইলেও মাঝে মাঝে কয়েকটি বেশ বড় পিঁপড়াকেও ঐ সারিতে দেখিতে পাইবে। ঐ বড় পিঁপড়াগুলি খাবার জিনিস বহন করিয়া লইয়া যায় না। ইহারা **সৈনিক** পিঁপড়া, অন্য পিঁপড়াগুলির কাজ দেখা আর উহাদের বিপদ হইতে বাঁচানোই সৈনিক পিঁপড়ার কাজ। যে সকল পিঁপড়া খাবার জিনিস বহন করিয়া লইয়া যায় উহাদিগকে **শ্রমিক** বা **কর্মী পিঁপড়া** বলে।



(১) কর্মী, (২) পুরুষ, (৩) স্ত্রী এবং (৪) সৈনিক পিঁপড়া

পিঁপড়ার বাসায় ঐ দুই শ্রেণীর পিঁপড়া ছাড়া একটি **রাণী** ও কয়েকটি **পুরুষ** পিঁপড়া থাকে। এই দুই প্রকার পিঁপড়ার পাখা থাকে; শ্রমিক ও সৈনিক পিঁপড়ার পাখা থাকে না।

পিঁপড়ার সামাজিক জীবন—পিঁপড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে আর নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া সবরকম কাজ করে। সেই কারণে পিঁপড়াকে সামাজিক জীব বলে।

স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ারা বসন্তকালে বাসা হইতে বাহির হইয়া একত্র উড়িয়া বেড়ায়। তখন ইহাদের অনেকগুলিকে পাখীরা খাইয়া ফেলে।

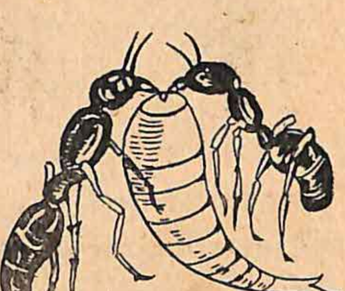
কোনও রকমে রাণী পিঁপড়া বাঁচিয়া গেলে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে থাকে, তখন কর্মী পিঁপড়ারা উহাকে বাসায় লইয়া আসে। রাণী পিঁপড়া বাসায় আসিয়া শুধু ডিম পাড়ে, ডিম পাড়া ভিন্ন উহার কোনও কাজ নাই।

কর্মী পিঁপড়ার মধ্যে কয়েকটি চরের কাজ করে, অর্থাৎ ইহারা ঘুরিয়া দেখে কোথায় খাবার জিনিস আছে। খাবার জিনিসের সন্ধান পাইলে বাসায় গিয়া খবর দেয়। তখন পিঁপড়ারা আসিয়া সারি বাঁধিয়া খাবার জিনিস বাসায় লইয়া যায়।

কর্মীদের মধ্যে একদল বাসা তৈরি করা বা মেরামত করার কাজে ব্যস্ত থাকে। পচা কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি জিনিসের গুঁড়ার সহিত তাহাদের মুখের রস মিশাইয়া উহারা কুঠুরিগুলির দেওয়াল ও ছাদ প্রস্তুত করে।

এক দল কর্মী ডিম, শূককীট ও মূককীটগুলিকে পৃথক পৃথক কুঠুরীর মধ্যে রাখে, শূককীটকে খাদ্য দেয় ও রাণীর সেবা করে।

পিঁপড়ার যুদ্ধ—কখনও কখনও দুই দল পিঁপড়ার মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহারা সন্ধি করিতে জানে না। যতক্ষণ না এক দল হারে ততক্ষণ যুদ্ধ চলে। যাহারা যুদ্ধে জিতিয়া যায় তাহারা অন্য দলের বাসা ভাল হইলে সেই বাসায় চলিয়া আসে; নতুবা ঐ বাসা হইতে সব ডিম, শূককীট ও সঞ্চিত খাদ্য লুটিয়া লইয়া যায়।



এফাইডিস বা পিঁপড়া-গোরু

পিঁপড়ার কৃষিকার্য—ব্যাঙের ছাতা একরকম উদ্ভিদ। স্পোর নামক একপ্রকার জিনিস হইতে ঐগুলি জন্মে। পিঁপড়ারা ঐ স্পোর সংগ্রহ

করিয়া রাখে এবং বর্ষাকালে সেঁতসেঁতে মাটিতে স্পোর ছড়াইয়া দেয়। ব্যাঙের ছাতা গজাইলে ঐগুলি তখন মনের আনন্দে খাইতে থাকে।

পিঁপড়া-গোরু—কোনও কোনও পিঁপড়া 'এফাইডিস' নামক একপ্রকার কীট পালন করে। আম ও জাম গাছের লাল পিঁপড়ারাই প্রধানতঃ এই পোকা পালন করে। পিঁপড়ারা ঐ পোকাকে গাছের উপর চরাইয়া বেড়ায়, পরে ইহাদের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়া একপ্রকার মধুর মত রস বাহির করিয়া পান করে।

মৌমাছির জীবনবৃত্তান্ত

মৌমাছি একপ্রকার পতঙ্গ। সুতরাং ইহার জীবনেও ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি এই চারিটি অবস্থা আছে।

মৌমাছিরা চাক প্রস্তুত করিয়া বাস করে। এক একটা চাকে একটি রাণী মৌমাছি হাজার হাজার শ্রমিক ও দুই এক শত পুরুষ মৌমাছি থাকে।



(১) রাণী, (২) কর্মী ও (৩) পুরুষ মৌমাছি

পুরুষ মৌমাছি কোনও কাজ করে না, ইহাদের পিছনে হুল নাই, ইহারা বেঁটে। রাণী মৌমাছির পেট লম্বা, ইহার হুল আছে। শ্রমিক মৌমাছিরও হুল আছে। শ্রমিক মৌমাছির পিছনের দুই পায়ে হাঁটুর মত সন্ধি বা জোড় আছে। উহার মধ্যে পরাগ-স্থলী বা পরাগ রাখিবার স্থান আছে। কর্মীরা ফুল হইতে মধু পান করিয়া ঐ থলিতে করিয়া পরাগ বা রেণু লইয়া আসে।

রাণী মৌমাছি চাকের প্রত্যেক খোপে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। তখন কর্মীরা প্রত্যেক খোপে কিছু কিছু পরাগ আনিয়া রাখে। ঐ পরাগ বা ফুলের রেণু মৌমাছির শূককীটদের খাদ্য। খোপে খোপে পরাগ রাখিবার পর কর্মীরা ঐ খোপগুলি মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি ঐ খোপ কাটিয়া বাহিরে আসে।

কর্মী মৌমাছিরাই চাক প্রস্তুত করে। মৌমাছির চাকে প্রত্যেক খোপে ছয়টি করিয়া কোণ থাকে। কর্মীদের শরীর হইতে মোম আসিয়া পেটের নীচে জমে। তখন উহারা উহাদের পা দিয়া ঐ মোম তুলিয়া মুখের লালার সহিত মিশাইয়া বাসা প্রস্তুত করে।

রাত্রি প্রভাত হওয়ার পরই কর্মী মৌমাছিরা বিভিন্ন দিকে বাহির হইয়া ফুল হইতে মিষ্ট রস ও রেণু সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে। ঐ মিষ্ট রস উহাদের শরীরের ভিতর মধুস্থলিতে থাকে। সেখানে উহার কিছুটা হজম হইলে মধু প্রস্তুত হয়। তখন উহারা শূন্য খোপগুলি মধু দিয়া পূর্ণ করে।

অনুশীলনী

১। প্রজাপতির জীবনকথা বর্ণনা কর। রেশম বলিলে কি বোঝায়? উহা আমরা কোথা হইতে পাই?

২। মশার জন্মবৃত্তান্ত বল। ইহারা কিভাবে আমাদের অনিষ্ট করে?

৩। ব্যাঙের শরীরের গঠনের বিশেষত্ব বল। উহারা কিভাবে কোথায় শৈশব অবস্থা কাটায়? ইহারা কি আমাদের কোনও উপকার করে?

৪। এক-এক দলে কয়প্রকার পিঁপড়া থাকে? পিঁপড়াকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন?

৫। মৌমাছির জীবন কথা বর্ণনা কর। ইহারা কি জিনিস দিয়া চাক প্রস্তুত করে? ফুলের মিষ্ট রস ও মধুতে প্রভেদ কি?

৬। পিঁপড়া ও মৌমাছির সামাজিক জীবন তুলনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব দেহের সাধারণ জ্ঞান

নরকঙ্কাল

খড় ও বাঁশ দিয়া আগে কাঠামো তৈরি করিয়া তাহার উপর মাটি লাগাইয়া মাটির মূর্তি গড়া হয়। সেইরূপ মানুষের হাড়ের কাঠামোটার উপর মাংসপেশী ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা মানুষের শরীর তৈরী হইয়াছে।

মানুষের শরীরের সবগুলি হাড়ের কাঠামোকে **নরকঙ্কাল** বলে। মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা ২০৬।

নর-কঙ্কালের চারিটি অংশ—করোটি, দেহকান্ড, ঊর্ধ্ব শাখা ও অধঃ শাখা।

মাথার খুলিকে **করোটি** বলে। দুই হাতের হাড়গুলিকে ঊর্ধ্ব শাখা ও দুই পায়ের হাড়গুলিকে **অধঃ শাখা** বলে। হাত, পা, মাথা ছাড়া শরীরের অন্য বাকী অংশের হাড়কে **দেহ কান্ড** বলে।

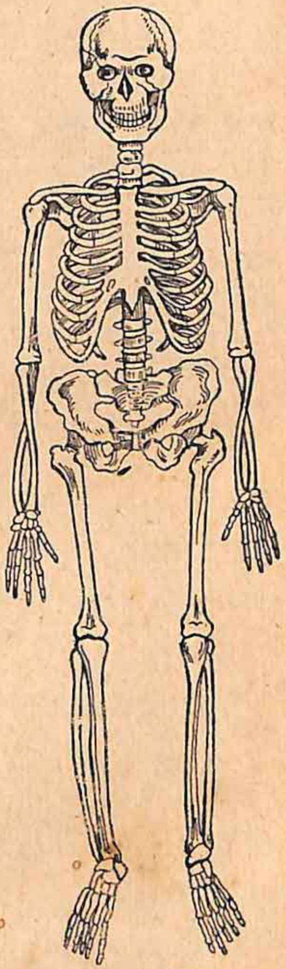
অনেকগুলি চেপ্টা হাড় দ্বারা মাথার খুলিটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা একটি কুঠুরির মত, ইহাতে আমাদের মস্তিষ্ক বা ঘিলু থাকে।

মাথার খুলির সহিত সংযুক্ত মেরুদণ্ডের হাড় কোমরের নীচে পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। উহা অনেকগুলি খন্ড খন্ড হাড়ের সমষ্টি ; দুই খণ্ডের মধ্যে নরম উপাস্থি আছে বলিয়াই আমরা সহজে আমাদের শরীর বাঁকাইতে পারি।

মেরুদণ্ডের হাড় হইতে দশজোড়া পাঁজরার হাড় আসিয়া বুকের দিকে একখানা হাড়ের সহিত যুক্ত হইয়া বক্ষপিঞ্জরের কুঠরীটি প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ কুঠরীতে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিন্ড থাকে।

কোমরের নিকট আবার কয়েকখানি চেপ্টা হাড় মিলিয়া একটি কোটর প্রস্তুত হইয়াছে।

নরকঙ্কালের ছবি পাশে দেওয়া হইল। হাড়গুলির সাধারণ আকৃতি দেখিয়া রাখ। লক্ষ্য কর কনুই হইতে হাতের কব্জীর মধ্যে ২ খানা করিয়া হাড় আছে, সেইরূপ হাঁটু হইতে পায়ের গোড়ালির মধ্যে ২ খানা করিয়া হাড় আছে।



নরকঙ্কাল

দেহ-যন্ত্র

মানুষের শরীরে নানারূপ যন্ত্র আছে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, চামড়া, আমাদের এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে এক-একটি যন্ত্র বলা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের শরীরে আরও অনেক যন্ত্র আছে। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃত প্রভৃতিও আমাদের দেহ-যন্ত্র। মাথার মধ্যে যে মস্তিষ্ক বা ঘিলু আছে উহাই আমাদিগকে বিচার-বুদ্ধি জোগাইতেছে। প্রত্যেক যন্ত্র সম্পর্কে বহু কথা জানিবার আছে, তাহা তোমরা বড় হইলে শিখিবে।

রক্ত ধমনী ও শীরা

রক্তের মধ্যে রক্তরস, লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা আছে। সাধারণতঃ শ্বেত কণিকা খুব অল্প থাকে বলিয়া রক্ত লাল দেখায়। কোনও রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকিলে শ্বেত কণিকারা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে ; সেইজন্য রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলেই আমাদের রোগ হয় না। কিন্তু শরীরে যদি জীবাণু সংখ্যায় খুব বেশী ঢুকিয়া যায় তবে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া হারিয়া যাইতে পারে। আমাদের শ্বেত কণিকা জীবাণুদের সহিত যুদ্ধে হারিয়া গেলে আমাদের রোগ হইবে।

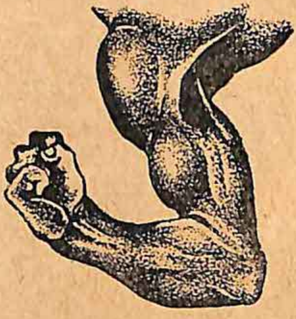
আমাদের শরীরের মধ্যে দুই প্রকার নলের ভিতর দিয়া বিপরীত দিকে রক্তের স্রোত বহিতেছে। বুকের বাম দিকে যেখানে সব সময়ই ধুক্‌ধুক্ শব্দ হইতেছে ঠিক তাহার নীচেই হৃৎপিন্ড আছে। যে সকল নলের ভিতর দিয়া হৃৎপিন্ড হইতে রক্ত শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া যায় উহাদিগকে **ধমনী** বলে; আর যে সকল নলের ভিতর দিয়া রক্ত শরীরের সকল স্থান হইতে হৃৎপিন্ডে গিয়া পোঁছায় উহাদিগকে **শিরা** বলে।

চামড়ার ঠিক নীচেই যে সকল নল দিয়া রক্ত চলে ঐগুলি শিরা ; আর ডাক্তার বা কবিরাজ হাত ধরিয়া যে নাড়ী পরীক্ষা করেন, সেই নলগুলি ধমনী।

প্রতি মুহূর্তে শরীরের সব স্থান হইতে দূষিত রক্ত হৃৎপিন্ডে গিয়া পোঁছিতেছে, এবং হৃৎপিন্ড হইতে ধমনীর ভিতর দিয়া বাহির হইয়া ফুস্‌ফুসের উপরের রক্ত-জালিকার মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসিবার কালে শোধিত হইয়া হৃৎপিন্ডে পড়িতেছে। আবার হৃৎপিন্ড সংকুচিত হইবার কালে শোধিত রক্ত শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া যাইতেছে।

মাংসপেশী

আমাদের শরীরে হাড়ের উপর সব জায়গায়ই কিছু মাংস আছে। কিন্তু মাংস পরীক্ষা করিলে ইহাতে সুতার মত কতকগুলি অংশ দেখা যায়। ঐ সুতার মত অংশগুলিকে তন্তু বলে। অনেকগুলি মাংস-তন্তু মিলিয়া এক-একটি মাংসপেশী প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের শরীরের যে কোনও স্থানের মাংসে অনেকগুলি মাংসপেশী আছে। শরীরের যে কোনও স্থানে একদিকের মাংসপেশী সংকুচিত করিলে বিপরীত দিকের মাংসপেশী সটান হয়। মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারাই আমরা আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারি।



মাংসপেশী

আমরা আমাদের হাত বা পায়ের মাংসপেশী ইচ্ছামত চালনা করিতে পারি—ইহাদিগকে **ইচ্ছাধীন** বা **আয়ত্তাধীন** মাংসপেশী বলে। শরীরের ভিতর পাকস্থলি, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতিতে যেসব মাংসপেশী আছে ঐগুলিকে আমরা ইচ্ছামত চালনা করিতে পারি না—ঐগুলিকে **অনিচ্ছাধীন** বা **অনায়ত্ত** মাংসপেশী বলে।

চামড়া

মাংসপেশীর উপরে আমাদের চামড়া রহিয়াছে। চামড়ার সকলের উপরে মরা-চামড়ার এক স্তর থাকে, উহার নীচে আরও দুইটি স্তর আছে,

এই দুই স্তরের প্রথম স্তরে আমাদের স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণের জন্য সূক্ষ্ম গোল গোল পদার্থ থাকে, নীচের স্তরে লোমের গোড়া, ঘর্মগ্রন্থি ও চর্বি-কোষ থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। চামড়া দ্বারা আমরা স্পর্শের অনুভূতি পাই—অর্থাৎ কোনও জিনিস আমাদের চামড়ায় লাগিলে আমরা উহা কিরূপ



চামড়ার বিভিন্ন স্তরের গঠন

জিনিস, গরম কি ঠাণ্ডা, কঠিন কি তরল এই সব বুঝিতে পারি। চামড়ার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঘামের সঙ্গে আমাদের শরীর হইতে অনেক দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

পরিপাক প্রনালী

আমাদের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার পর্যন্ত একটা নল আছে। ইহার নানা অংশ নানারূপ—কোনও আংশ মোটা, কোনও অংশ সরু; আর শেষের দিকের বহু লম্বা এক অংশ কুণ্ডলী পাকানো। ঐ নলকে **পৌষ্টিক নল** বলে।

যকৃত আর পেংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় নামক আরও দুইটি দেহাংশ হইতে দুইটি নল আসিয়া ঐ পৌষ্টিক নালীতে মিশিয়াছে। ঐ তিন অংশকে স্থলী পৌষ্টিক নালীর এক মোটা অংশ।

আমরা খাবার জিনিস দাঁত দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলি। ঐ জিনিস তখন আমাদের কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া গিয়া পাকস্থলীতে পড়ে। পাকস্থলী পৌষ্টিক নালীর এক মোটা আংশ।



পরিপাক প্রণালী

ভুক্তদ্রব্য বা যাহা আমরা খাইয়াছি সেই জিনিস পাকস্থলীতে পেঁাছিলে পাকস্থলী তালে তালে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। ইহার ফলে পাকস্থলীর গা হইতে এক প্রকার রস আসিয়া ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশে। ঐ রসকে **জারক রস** বলে।

পরে যকৃত হইতে পিত্তরস অসিয়া উহার সহিত মিশে। আরও পরে অগ্ন্যাশয় হইতেও এক রকম রস আসিয়া উহাতে মিশে। ভুক্তদ্রব্য পরে পাকস্থলী হইতে সরু এক নলের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে। ঐ নলকে ক্ষুদ্র অন্ত্র বলে। খাদ্য হজম হইলে ঐ ক্ষুদ্র অন্ত্রেই ভুক্তদ্রব্যের সার পদার্থ খাদ্যরস রূপে শোধিত হয়। উহার দ্বারাই দেহের পুষ্টি ও ক্ষয়-নিবারণ হয়। পরে শেষের মোটা নল বা বৃহদান্ত্রের ভিতরে সব মল জমে।

আমরা যাহা খাই তাহাতে যদি এমন কোনও জিনিস থাকে যাহা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তবে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যরস হজম হয় না। তখনই আমাদের পেটের অসুখ হয়।

পাচনতন্ত্রের কোনও অংশ যদি উহার কাজ ঠিকমত না করে তাহা হইলেও খাদ্যের সার পদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয় না। সেই কারণেও আমাদের পেটের অসুখ হইতে পারে।

অনুশীলনী

১। নরকঙ্কাল কি জিনিস? আমাদের শরীরে ইহার কাজ কি? নরকঙ্কালে হাড়ের সংখ্যা কত?

২। কঙ্কালের মধ্যে কুঠরী আছে। ঐ কুঠরীগুলি কোন্ কোন্ স্থানে আছে এবং উহাদের কাজ কি?

৩। আমাদের শরীরের কয়েকটি দেহ-যন্ত্রের নাম কর এবং উহাদের কাজ উল্লেখ কর।

৪। (ক) আয়ত্তাধীন ও অনায়ত্ত মাংসপেশীর উদাহরণ দাও।
(খ) শিরা ও ধমনীর মধ্যে প্রভেদ কি?

৫। পরিপাক প্রণালীর অংশগুলি কি কি? কিভাবে আমাদের খাদ্য হজম হয় তাহা মোটামুটি বুঝাইয়া দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

আকাশ পর্যবেক্ষণ (ক)

দিনের আকাশের দিকে তাকাইলে হয় সূর্য, না হয় মেঘ অথবা নীল আকাশ দেখিতে পাইবে।

বিভিন্ন প্রকার মেঘের সহিত পরিচয়

শরৎকালে আকাশের দিকে তাকাইলে প্রায়ই মনে হয় কে যেন নীল আকাশের গায়ে ধব্‌ধবে সাদা পেঁজা তুলার স্তূপ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ঐরূপ মেঘকে **স্তূপ মেঘ** বলে। একখানা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিবে ধীরে ধীরে ইহার চেহারা কেমন বদলাইয়া যাইতেছে। ঐরূপ মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় না।

স্তূপ মেঘ আকাশের কিনারার দিকে থাকে, মাঝখানে খুব কমই দেখা যায়। সূর্য ঐ মেঘের পিছনে থাকিলে মেঘের সামনের দিকের মাঝখানের রং কালো হয় আর সীমারেখাটা রূপালী রং ধরে।

কখন কখন আকাশের নীচের দিকে মাটির সহিত সমান্তরাল হইয়া কয়েক খন্ড মেঘের টুকরাকে ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায় ; ইহাকে **স্তর মেঘ**



স্তূপ মেঘ ও বাদল মেঘ

বলে। বর্ষা ও শরৎকালের সকাল অথবা বিকালবেলা ঐ মেঘ দেখা যায়। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় স্তর মেঘে নানারূপ রং দেখা যায়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় না।

আবার কখন কখন গ্রীষ্মকালে যখন নীল আকাশের গায়ে কোথাও কোন মেঘের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ না তখন মাথার উপর বরাবর আকাশে একখানা পাতলা ছড়ানো তূলার মত একটুখানি মেঘ দেখিতে পাইবে।

ঐ মেঘকে অলক মেঘ বলে। ঐ মেঘ আকাশের বহু উপরে থাকে। ঐ মেঘ হইতেও কখন বৃষ্টি হয় না।

বৃষ্টি হয় বাদল মেঘ হইতে। বাদল মেঘের কোনও নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। উহা আকাশে খুব নীচে ভাসিয়া বেড়ায়। বাদল মেঘের রং কালো অথবা ঘোলাটে সাদা হয়।



অলক মেঘ ও স্তর মেঘ

সাধারণত ঝড়ের আগে আকাশের এক কোণে, কালো এক খণ্ড মেঘ উঠিয়া দ্রুত আকাশ ছাইয়া ফেলে। ঐরূপ মেঘ হইতে আমাদের দেশে কাল-বৈশাখী ঝড় উঠে। বৈশাখের সন্ধ্যায় আকাশের পশ্চিম-উত্তর কোণে সর্বপ্রথম ঐ মেঘ দেখা দেয়।

প্রধান কয়েকপ্রকার মেঘ দেখিয়া ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিও।

বৃষ্টির কারণ

বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে। এই জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। একটা কাচের গ্লাস অথবা যে কোনও পাত্রে কিছু বরফ রাখিয়া দিলে পাত্রের গায়ে বাহিরের দিকে বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া যায়। বায়ুর জলীয় বাষ্পই ঠান্ডায় জমিয়া জলকণায় পরিণত হয়।

সমুদ্র, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি হইতে সূর্যের তাপে সব সময় জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ঐ জলীয় বাষ্প বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে। তখন আমরা উহা দেখিতে পাই না। যখন ঐ বাষ্প উপরে উঠিয়া ঠান্ডা হয় তখন ঐ জলীয় বাষ্প জমিয়া ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। ঐ কণাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহারা স্বচ্ছন্দে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। তখন আমরা ঐগুলিকে দেখিতে পাই ও তাহাকে মেঘ বলি।



বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ

মেঘ বেশী ঠান্ডা হইলে জলের কণাগুলি একত্র হইয়া বড় বড় ফোঁটার আকার ধারণ করে। ঐগুলি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না, মাটিতে পড়ে। উহাকেই আমরা **বৃষ্টিপাত** বলি।

শিশির

শরৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্যন্ত রাত্রে শিশির পড়ে। আমরা ঘুম হইতে উঠিয়া সকালে দেখি ঘাসের পাতায় বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া রহিয়াছে।

বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়াই শিশির উৎপন্ন হয়। গ্লাসের মধ্যে বরফ রাখিলে গ্লাসের বাহিরের দিকের গায়ে যে বায়ু লাগিতেছে উহা ঠাণ্ডা হয়। তখন ঐ বায়ুর জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হইয়া গ্লাসের বাহিরের গায়ে জমিয়া যায়। শিশিরও ঠিক এইভাবে উৎপন্ন হয়।

শীতের রাত্রে যেসব বস্তু বাহিরে থাকে ঐগুলি ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কোনও কোনও জিনিস এত ঠাণ্ডা হয় যে, ঐ জিনিসের চারিপাশে যে বায়ু থাকে সেই বায়ুর মধ্যের জলীয় বাষ্প ঐ বস্তুর উপর জমিয়া যায়। যে জিনিস তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় তাহার উপর বেশী জল জমে। তাই ধাতুদ্রব্যের উপর বেশী শিশির জমিতে দেখা যায়।

সূর্য

আকাশে আমরা চাঁদ, তারা, গ্রহ প্রভৃতি দেখিয়া থাকি। ইহাদের প্রত্যেকটিকে **জ্যোতিষ্ক** বলা হয়। সূর্যও আকাশের একটি জ্যোতিষ্ক, সূর্যের আলোক ও তাপ না থাকিলে কোন সজীব পদার্থই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইত না। সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্যকেই আমরা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখি ; সূর্যই আমাদের আলোকের উৎস—প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আলোক, তাপ প্রভৃতি সর্বপ্রকার শক্তির সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ উৎসই সূর্য।

কয়লা প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন ; পেট্রলিয়াম প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ হইতে নিঃসারিত তৈল। সূর্য না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচে না, সুতরাং আমরা কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ ও আলোক পাই, পেট্রল পোড়াইয়া ইঞ্জিন চালাইয়া ডাইনামো ঘুরাইয়া যে বিদ্যুৎ পাই তাহা সূর্যের শক্তি হইতেই আসে। এই ভাবে চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, সূর্যই আমাদের সকল প্রকার শক্তির উৎস।

সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য যে কত প্রচণ্ড তাপ ও প্রখর আলোক পৃথিবীকে দান করে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। এই সূর্য কিন্তু একটি গ্যাসীয় জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, তের লক্ষ পৃথিবীকে একত্র করিলে যত বড় হয়, সূর্য একাই তত বড়। পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে বলিয়া ইহা এত ছোট দেখায়।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে। আর ঐ ভাবে ঘুরিবার সময় পৃথিবী লাটিমের মত নিজের চারিদিকেও চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার ফলে আমাদের দিন রাত্রি হইতেছে। আমরা দেখি সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে উঠিয়া পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। সূর্য স্থিরই আছে; আমাদের পৃথিবী লাটিমের মত প্রতি দিন নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে একবার ঘুরিয়া আসিবার ফলেই আমরা সূর্যকে উল্টা দিকে ঘুরিতে দেখি। এইরূপ ভুল আমরা অনেক স্থলেই দেখিয়া থাকি। তোমরা রেল গাড়ীতে চড়িয়াছ। যখন রেল গাড়ী দ্রুত চলিতে থাকে তখন মনে হয় যেন রাস্তার পাশের গাছ-পালা বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সূর্যের কাজ

আমরা পৃথিবীর উপর জন্মিয়াছি। জীবন রক্ষার জন্য ইহার জল-বায়ু প্রচুর পাইতেছি; মাটি খুঁড়িয়া শস্য উৎপন্ন করিয়া খাইয়া বাঁচিয়া আছি। কিন্তু সূর্য হইতে তাপ ও আলোক পৃথিবীতে না আসিলে উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মগ্রহণ করিত না।

তোমরা জান পাতার উপর সূর্য কিরণ পড়িলে পাতা অঙ্গারাত্মকরণ করে; সুতরাং সূর্যকিরণ না পাইলে গাছ বাঁচে না, আর উদ্ভিদ না হইলে কোন প্রাণীও বাঁচিতে পারে না।

প্রাণী মাত্রই উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মাংসাশী প্রাণীরা উদ্ভিদ্ খায় না সত্য, কিন্তু উহারা যেসব প্রাণীর মাংস খায় সেই সকল প্রাণী সাধারণত উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

শ্বাসকার্য দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্তে বায়ুকে দূষিত করিতেছি; অঙ্গারাত্মকরণের সময় উদ্ভিদ্ ঐ বায়ু শোধন করিয়া দিতেছে।

উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া যদি আমাদের বাঁচা সম্ভব হইত তথাপি সূর্যের তাপ না পাইলে ঠাণ্ডায় আমরা মরিয়া যাইতাম। শুধু তাহাই কেন? ভীষণ ঠাণ্ডার জন্য পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টিই হইত না। সূর্য হইতে কোনও কারণবশত পৃথিবীতে তাপ না আসিলে পৃথিবীর সব জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে আর বেশী দিন ঐরূপ চলিলে হয়তো বায়ু প্রথমে তরল হইয়া শেষে কঠিন হইয়া যাইবে।

সুতরাং সূর্যই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সূর্যই পৃথিবীকে জীববাসের উপযুক্ত করিয়াছে।

অনুশীলনী

১। তুমি কয়প্রকার মেঘ চেন? উহাদের ছবি আঁকিয়া দেখাও। সাধারণতঃ কোথায় ও কখন কিরূপ মেঘ দেখা যায় বল।

২। (ক) ঘাসের উপর শিশির জমে কিরূপে?

(খ) মেঘ কি বস্তু? কিভাবে উহা উৎপন্ন হয়?

(গ) বৃষ্টি কেন হয়?

৩। সূর্য কিরূপ জিনিস? উহা আমাদের নিকট হইতে কত দূরে আছে? সূর্য আমাদের জন্য কি করে?

দ্বিতীয় পাঠ

আকাশ-পর্যবেক্ষণ (খ)

চন্দ্র

চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। গ্রহগণ যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, উপগ্রহগণ তেমনি গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সকল গ্রহের উপগ্রহ নাই।

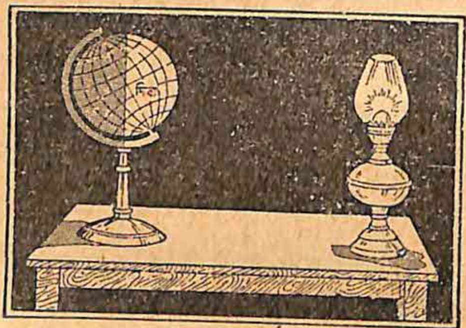
চন্দ্র পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ২৯½ দিনে একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতেছে। আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্রই আমাদের সবচেয়ে নিকটে। চন্দ্রও পৃথিবীর মত একটি গোলাকার পিন্ড। কিন্তু পন্ডিতগণ মনে করেন যে, চন্দ্রে জল বা বায়ু নাই, কাজেই জীবন্ত পদার্থ নাই।

চন্দ্রের একই পিঠ সর্বদা আমাদের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে; সেই জন্য আমরা চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে কি আছে তাহা দেখিতে পাই না।

চন্দ্রের যে পিঠ আমাদের দিকে ফিরিয়া থাকে উহা অত্যন্ত উঁচু-নীচু। চন্দ্রের গায়ে পাহাড়গুলি খুব বেশী উঁচু এবং চন্দ্রের পিঠে অসংখ্য ছোট-বড় গহবর আছে। চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই। সূর্যের আলোক চন্দ্রে পড়িলে ঐ আলোক প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে পেঁছে। ঐ প্রতিফলিত আলোকেই আমরা চন্দ্রকে দেখি। চন্দ্রের শুষ্ক সমুদ্রগুলি পৃথিবী হইতে চন্দ্রের অন্য অংশের তুলনায় কালো দেখায়। চন্দ্রের ঐ অনুজ্জবল অংশকে **চন্দ্রের কলঙ্ক** বলে।

চন্দ্রের কলা

যে রাত্রিতে আকাশে মেঘ থাকে না কিন্তু চাঁদ থাকে সেই রাত্রিতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকময় হইয়া যায়। শীতকালের পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল হয়। কিন্তু চাঁদ পূর্ণিমার পরের রাত্রি হইতে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে এবং অমাবস্যা রাত্রে আর চাঁদকে আকাশে দেখাই যায় না। পরে আবার দ্বিতীয়ার চাঁদ একখানা কাস্তের মত সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে দিনের পর



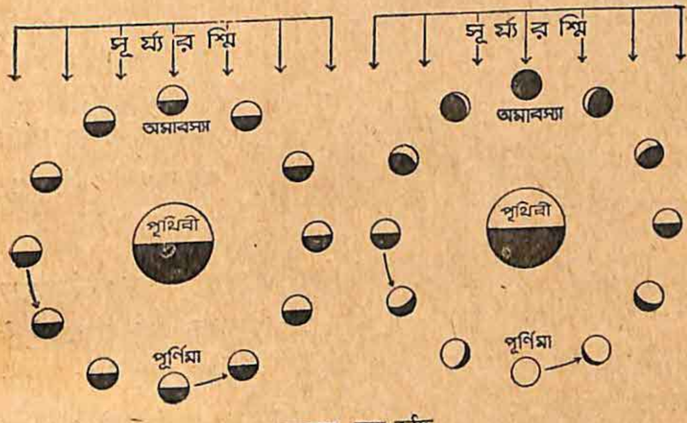
গোলক ও বাতি লইয়া পরীক্ষা

দিন ইহার উজ্জ্বল অংশ বাড়িতে থাকে এবং পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে পূর্ব আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়। এইভাবে চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ ক্রমশঃ কমিতে ও বাড়িতে থাকে। ইহাকে **চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি** বলে।

কেন এরূপ হয় তাহা বোঝাও খুব কঠিন নহে। একটা কথা মনে রাখ যে, বলের মত কোন গোল জিনিসের উপর দূর হইতে আলোক পড়িলে বলের অর্ধাংশের বেশী এক সঙ্গে আলোকিত হয় না।

টেবিলের উপর বাতি জ্বালাইয়া দূরে একটি গোলক রাখিয়া পরীক্ষা করিতে পার। যদি তুমি আলোর দিকে থাকিয়া দূর হইতে গোলকটি দেখ তবে একটা বৃত্তাকার উজ্জ্বল অংশ দেখিতে পাইবে।

এখন বাতি ও গোলক ঠিক রাখিয়া গোলকটির চারিদিকে বা গোলক-সহ টেবিলের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া যাও। তুমি একটু ঘুরিয়া গেলেই গোলকের উজ্জ্বল অংশের সবটা আর দেখিবে না। শেষে আলোর বিপরীত দিকে আসিলে গোলকটির উজ্জ্বল অংশের একটুও আর দেখিতে পাইবে না। আরও ঘুরিয়া গেলে ক্রমশঃ আবার গোলকের উজ্জ্বল অংশ একটু একটু করিয়া দেখা যাইবে ও শেষে বাতির পিছনে আগের



চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি

জায়গায় ফিরিয়া আসিলে আবার গোলকটির উজ্জ্বল অংশের সবটাই দেখিতে পাইবে। এখন চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হয়তো অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এক মাসে একবার ঘুরিয়া আসে। সূর্যের আলোকে প্রতিদিন চাঁদের অর্ধেক আলোকিত হয়। কিন্তু সব

দিন আমরা এমন অবস্থায় থাকি না যাহাতে চাঁদের উজ্জ্বল অংশের সবটা আমরা দেখিতে পাই। কেবলমাত্র পূর্ণিমারাত্রে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য এমন অবস্থায় থাকে যে, আমরা চাঁদের উজ্জ্বল অংশের সবটাই দেখিতে পাই। অমাবস্যার দিন আমরা চাঁদের উজ্জ্বল অর্ধেকের একটুও দেখিতে পাই না। ঐ দিন দিনের বেলা আকাশে চাঁদ থাকে এবং চাঁদের অন্ধকার দিক আমাদের দিকে ফিরিয়া থাকে।

চন্দ্রের কাজ

সূর্য না থাকিলে আমাদের যে অসুবিধা ঘটিত তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি—এক কথায় বলা যায় সূর্য না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না।

আকাশে চাঁদ না থাকিলে আমাদের সেইরূপ কোনও অসুবিধা ঘটিত না সত্য, কিন্তু রাত্রির আকাশ দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাই তাহা অনেক কমিয়া যাইত।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ২৯½ দিনে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। ঐ হিসাব ধরিয়া মুসলমানেরা মাস গণনা করেন এবং চাঁদের তিথি অনুযায়ী পর্ব দিন অর্থাৎ ঈদ, মহরম ইত্যাদির দিন স্থির করেন। হিন্দুরাও ঐ চাঁদের তিথি দেখিয়া তাহাদের পূজা-পার্বণের দিন ও সময় স্থির করেন। সুতরাং উভয় ধর্মের পর্ব ইত্যাদি স্থির করিবার জন্য আমাদিগকে চাঁদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফুলিয়া উঠে ও জোয়ারের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের নিকটে যাহারা বাস করে তাহারা জোয়ারের উল্টো স্রোতে নদীর উজান দিকে সহজে নৌকা চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

সন্ধ্যার আকাশে ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ক্যাসিওপিয়া

আকাশে মেঘ না থাকিলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটি দুইটি করিয়া তারা দেখা দেয় এবং অন্ধকার হইয়া গেলে আকাশে হাজার হাজার তারা দেখা যায়।

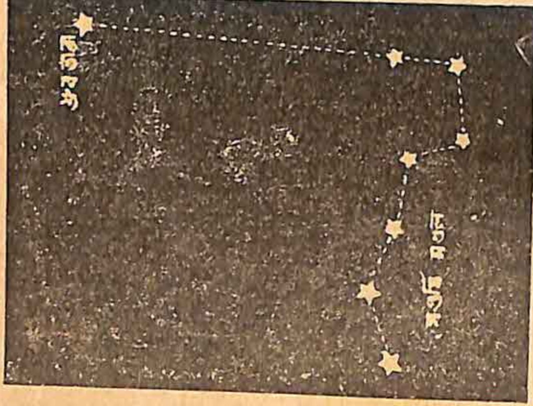
পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। সেই কারণে আমরা দেখি সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। চন্দ্র, তারা বা গ্রহ প্রভৃতি যে কোন জ্যোতিষ্ককে সন্ধ্যার সময় আকাশে যেখানে দেখা যায়, রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সরিতে দেখা যায়।

কয়েকটি তারা লইয়া মনে মনে কাল্পনিক রেখা দিয়া যোগ করিয়া এক একটা চিত্র মনে রাখিলে ঐ কয়েকটি তারাকে সর্বদা ঐ একই আকৃতির দেখা যায়। ঐরূপ যে কোন ২।৩টি তারার প্রতি নজর রাখিলেই দেখিবে যে উহারাও ক্রমশঃ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে। ঐরূপ পৃথক পৃথক কয়েকটি তারার বিশিষ্ট পুঞ্জকে **তারামণ্ডল** বলে।

তারা বা তারামণ্ডলকে পূর্ব আকাশে উদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা গেলেও উত্তর আকাশে এমন একটা তারা আছে যাহাকে কেহ কখনও স্থান পরিবর্তন করিতে দেখে নাই। ঐ তারাকে **ধ্রুবতারা** বলে।

ধ্রুবতারাকে সহজে চিনিয়া লইবার জন্য একটি বিশিষ্ট তারামণ্ডলের সাহায্য লওয়া হয়। ঐ তারামণ্ডলকে **সপ্তর্ষিমণ্ডল** বলে। কারণ ঐ মণ্ডলের প্রত্যেক তারার একটি করিয়া নাম আছে। নামগুলি আমাদের

দেশের মুনি ঋষিদের নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে। ঐ নামগুলি যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি।



চৈত্রের সন্ধ্যায় পূর্বাকাশে ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের পূর্ব দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখিতে পাইবে। ইহার আকৃতি একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত অথবা লেজ লাগানো ঘুড়ির মত। ইহার বাম দিকের দুইটি তারাকে মনে মনে যোগ করিয়া নীচের দিকে বাড়াইয়া দিলে একটি সাধারণ তারার উপর দিয়া যাইবে। উহাই **ধ্রুবতারা**।



চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় সপ্তর্ষির বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া

কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় ঠিক ঐ স্থানে ইংরাজী M অক্ষরের মত একটি মণ্ডল দেখিতে পাইবে। উহাতে পাঁচটি তারা আছে—ইহার মাঝখানের তারাটিকেই ধ্রুবতারা হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে দেখা যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ক্যাসিওপিয়া ধ্রুবতারার দুই বিপরীত দিকে আছে। সাধারণতঃ উত্তর আকাশে যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যায় তখন ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না।

চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় আকাশের মাঝখানে একটি চমৎকার সুন্দর বড় তারামণ্ডল দেখা যায়। ঐ তারামণ্ডলকে মানুষের আকৃতি কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেইজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে কালপুরুষ।



কালপুরুষ ও বৃষরাশি

এই তারামণ্ডলটির যে অংশকে মাথা কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে কয়েকটি তারা খুব নিকটে একটি পুঞ্জ তৈরী করিয়াছে। ইহা প্রায় মাথার বরাবর উপরে দেখা যায়। কালপুরুষের পায়ের দিক দক্ষিণ দিকে থাকে। ইহার মাঝখানে কটিবন্ধের বা বেল্টের মত তিনটি তারা এক সরল রেখায় দেখা যায়। ঐ তিনটি তারার এক প্রান্ত হইতে আবার কয়েকটি তারা নীচের দিকে গিয়াছে। উহাকে একটি তলোয়ার কল্পনা করা হইয়াছে। সমস্ত মিলিয়া ইহাকে সত্য সত্যই চমৎকার দেখায়।

সন্ধ্যাতারা

বৎসরের কিছু দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে পশ্চিম আকাশে একটি অতি উজ্জ্বল 'তারা' দেখা যায়। ইহার মত উজ্জ্বল তারা আকাশে আর একটিও দেখিবে না। ইহাকে **সন্ধ্যাতারা** বলে। আবার বৎসরের কিছু দিন ভোরের আগে ইহাকে পূর্বাকাশে দেখা যায়; তখন ইহাকে **শুকতারা** বলে।

কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে তারা নয়। ইহা পৃথিবীর মতই একটি গ্রহ, ইহার নিজের আলোক নাই, সূর্যের আলোকেই ইহা উজ্জ্বল দেখায়।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যেমন বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে সেইরূপ আরও ৯টি গ্রহ সূর্যকে নির্দিষ্ট সময়ে পর পর ঘুরিয়া আসিতেছে। সকল গ্রহ সূর্য হইতে সমান দূরে নয়। যে গ্রহ যত বেশী দূরে আছে, সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতেও তাহার তত বেশী সময় লাগে।

সূর্য হইতে পর পর সব গ্রহগুলির নাম—**বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো।** মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আছে গ্রহকণিকা বা একটি গ্রহের অনেকগুলি ভাঙা টুকরা। কোনও গ্রহেরই নিজের আলোক নাই, প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ আর ঐ সন্ধ্যাতারাও গ্রহ।

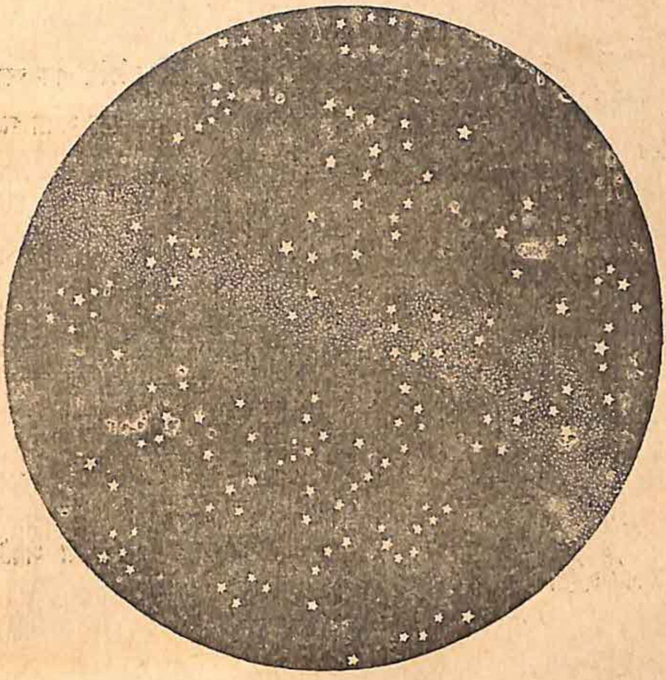
তারা এক-একটা সূর্যের মত প্রকাণ্ড বড় ও প্রচণ্ড গরম অগ্নিপিণ্ড। কিন্তু উহারা বহু দূরে আছে বলিয়া এত ক্ষুদ্র দেখায়।

গ্রহের আলো মিটমিট করে না, তারা হইতে যে আলো আসে তাহা মিটমিট করে।

শুক্র গ্রহ বা সন্ধ্যাতারার আলোকও স্থির। উহাকে সন্ধ্যাতারা বলিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে তারা নহে, উহা একটি গ্রহ।

ছায়াপথ

আকাশে ক্যাসিওপিয়া যেখানে দেখিবে সেই স্থান যেন ধোঁয়াটে মেঘের মত মনে হয়। শ্রাবণের সন্ধ্যায় একটু ভাল করিয়া তাকাইলে



রাত্রির আকাশে তারা ও ছায়াপথ

দেখিবে ঐ ধোঁয়াটে মেঘের মত স্থান আকাশে একটা বেশ প্রশস্ত রাস্তার মত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। আকাশের ঐ প্রশস্ত পথের মত অংশকে **ছায়াপথ** বলে।

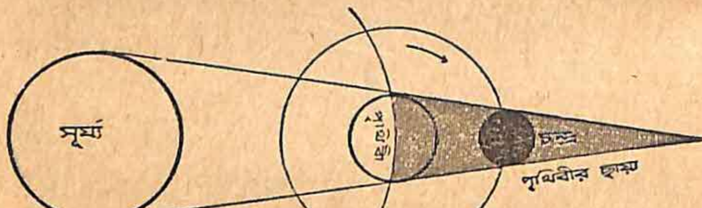
ছায়াপথে মেঘ নাই বা ধোঁয়া নাই। আকাশের ঐ স্থানে অগণিত তারা আছে, তাই উহা ঐরূপ দেখায়। বহু তারা এত দূরে আছে যে,

সেইগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। সেই কারণে ঐ স্থানকে ধোঁয়াটে বলিয়া মনে হয়।

ছায়াপথের নক্সা চিত্রে দেখিতে পাইবে।

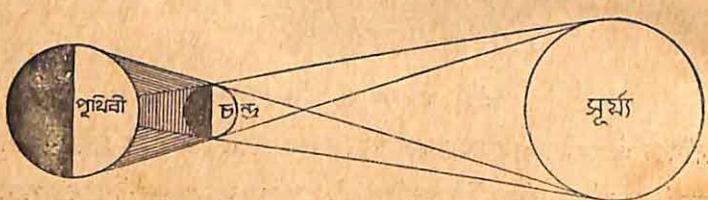
গ্রহণ

মাঝে মাঝে পূর্ণিমার দিন হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য চাঁদের এক অংশ বা সমস্ত চাঁদই ধীরে ধীরে যেন ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে আবার পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। ইহাকে **চন্দ্রগ্রহণ** বলে।



চন্দ্রগ্রহণ

সেইরূপ কদাচিৎ অমাবস্যার দিন সূর্যের এক অংশ বা সবটাই অন্ধকার হইয়া যায়—ইহাকে **সূর্যগ্রহণ** বলে।



সূর্যগ্রহণ

পূর্ণিমা রাত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব আকাশে চাঁদ উঠে। ঐদিন সূর্য, পৃথিবী আর চন্দ্র প্রায় এক সরল

রেখায় থাকে, পৃথিবী থাকে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে। তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে—ইহাই চন্দ্রগ্রহণের কারণ।

সকল পূর্ণিমাতেই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের খুব নিকটে থাকে কিন্তু চন্দ্র গিয়া ছায়ার মধ্যে ঢুকিয়া যায় না, সেই জন্য চন্দ্রগ্রহণ হয় না। ইহারও কারণ আছে, সেকথা পরে জানিতে পারিবে।

অমাবস্যার দিন দিনের বেলা চাঁদ আকাশে থাকে এবং পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য প্রায় এক সরল রেখায় থাকে। চাঁদ যেদিন ঠিক সূর্যের সামনে থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে সূর্যকে আড়াল করিয়া রাখে সেই দিন সূর্যগ্রহণ হয়। যে কারণে প্রতি পূণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না, সেই কারণে প্রতি অমাবস্যায়ও সূর্যগ্রহণ হয় না।

(গ) আবহাওয়া চিত্র

পৌষ-মাঘ মাসে আমাদের দেশে খুব শীত পড়ে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে আবার খুব গরম বোধ হয়। কিন্তু শীতকালে সবদিন সমান শীত পড়ে না, অধিকাংশ দিন আকাশ পরিষ্কার থাকে। আবার মাঝে মাঝে আকাশে মেঘও থাকে এমন কি দুই-এক দিন অল্প বৃষ্টিও হইয়া যায়।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে দিনের বেলা অসহ্য গরম বোধ হয়, কিন্তু প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা কাল-বৈশাখী ঝড় বহিতে আরম্ভ করে। যেদিন ঝড় বহে না সেইদিন রাত্রেও অসহ্য গরম বোধ হয়। দিনের সব সময় একই দিক হইতে বাতাস বহে না, আবার সব সময় সমান জোরেও বহে না।

কোনও দিনের বিভিন্ন সময়ের ঐরূপ বিভিন্ন অবস্থাকেই সেই দিনের আবহাওয়া বলে। কোনও এক স্থানের আবহাওয়ার ববরণ প্রত্যহ লিখিয়া রাখিলে উহাকে সেই স্থানের **আবহাওয়া-চিত্র** বলা যায়। উহা দেখিয়া গত বৎসর কোন্ দিন কিরূপ গিয়াছে দেখা যায় এবং আগামী বৎসর কোন্ দিন কিরূপ যাইবার সম্ভাবনা আছে তাহার ধারণা হয়।

আবহাওয়ার বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য একটি ছক কাটিয়া দেওয়া হইল। একখানা খাতায় ঐরূপ ছক কাটিয়া প্রতি মাসের অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ দিনের বিবরণ লিখিয়া রাখিবে। যে যে দিনে ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত হয় অথবা অসহ্য গরম বা দুরন্ত শীত পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই সেই দিনের বিবরণ অবশ্যই লিখিতে হইবে। ভূমিকম্প হইলে তাহারও উল্লেখ করিবে।

বৃষ্টি ও উত্তাপের পরিমাণ বৃষ্টিমান যন্ত্র ও থার্মোমিটার ছাড়া সঠিক লিখা যাইবে না, স্কুলে ঐ দুই যন্ত্র থাকিলে ঐগুলি দেখিয়া লিখিতে পার। স্কুলে যন্ত্র না থাকিলে অথবা স্কুল বন্ধ থাকিলে বৃষ্টির পরিমাণ বুঝাইবার জন্য এইরূপ লিখিয়া রাখিতে পার। যথা—"বেলা ৭-৩০ মিনিট হইতে ৯টা পর্যন্ত ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি হইয়াছে" অথবা "বিকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িয়াছে" অথবা "রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে" ইত্যাদি।

সেইরূপ বায়ুর উত্তাপ লিখিবার সময় থার্মোমিটার না পাইলে এইরূপ ভাবে দিনপঞ্জী রাখিও। যথা—"এই ঋতুর স্বাভাবিক উত্তাপ" "খুব বেশী গরম", "অসহ্য গরম" অথবা "কন্‌কনে ঠাণ্ডা", "দুরন্ত শীত" প্রভৃতি।

আবহাওয়া পঞ্জী

মাসের নাম ... ... স্থানের নাম ... ...

তারিখ	সময়	উত্তাপ	বায়ু কোন দিক হইতে বহিতেছে	ঝড় বৃষ্টির বিবরণ ও পরিমাণ	আকাশের অবস্থা	মন্তব্য

জানিয়া রাখ, ভারত সরকারের এক আবহাওয়া বিভাগ আছে। ঐ বিভাগের অধীনে কলিকাতার আলিপুরে চিড়িয়াখানার নিকটে একটি আবহাওয়া আফিস আছে। ঐ আফিসে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁত ভাবে আবহাওয়ার অবস্থার দৈনিক বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। ঐ সকল দেখিয়া কোথায় কখন ঝড় বা খুব বেশী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা জানা যায়। সমুদ্রে যে সকল জাহাজ চলে সেই সকল জাহাজের নাবিকদের পক্ষে ঐ খবর জানা খুবই প্রয়োজন। এরোপ্লেন চালাইবার জন্য উহা আরও বেশী প্রয়োজন।

কৃষকদের পক্ষেও আগামী দিনের আবহাওয়ার খবর আগেই জানিতে পারিলে লাভ আছে। সেইজন্য রেডিও এবং পত্রিকার মারফতে ঐ খবর জানানো হয়।

অনুশীলনী

১। চন্দ্র কিরূপ বস্তু? উহা পৃথিবী হইতে কতদূরে আছে? চন্দ্র-পৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ?

২। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি বলিলে কি বোঝায়? চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ মোটামুটি বল।

৩। চন্দ্র হইতে কি আমাদের কোনও উপকার হয়? চন্দ্রের কাজ কি?

৪। কালপুরুষ সন্ধ্যার আকাশে কখন দেখা যায়? কাগজে ফুট্‌কি আঁকিয়া ইহার আকৃতির ধারণা দাও।

৫। সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাহায্যে কি ভাবে ধ্রুবতারা চেনা যায়? সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারার অবস্থান ছবিতে দেখাও।

৬। ক্যাসিওপিয়া কিরূপ তারামণ্ডল? ছবি আঁকিয়া ইহার আকৃতি দেখাও। ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষির সহিত ইহার সম্বন্ধ কি?

৭। সন্ধ্যাতারা কাহাকে বলে? ইহা কখন কোন্ দিকে দেখা যায়? ইহা কি সত্যই তারা?

৮। ছায়াপথ কাহাকে বলে? কোন্ মাসের সন্ধ্যা আকাশে উহাকে ভালভাবে দেখা যায়?

৯। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে হয় সাধারণভাবে মোটামুটি বুঝাইয়া বল।

১০। আবহাওয়া চিত্র থাকিলে আমাদের কি লাভ হয়? আবহাওয়া আফিস কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাটি

মাটির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত; সুতরাং অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি যে সকল স্থানের মাটি এক রকম নহে। কোন মাটিতে বালি খুব বেশী থাকে, উহাকে **বেলে মাটি** বলে। আবার কোন মাটিতে জল পড়িলেই কাদা হইয়া যায় আর ঐ কাদা হাতে পায়ে লাগিয়া আঠার মত আটকাইয়া থাকে, ঐরূপ মাটিকে **এ'টেল** মাটি বলে। আর যে মাটিতে প্রায় সমান সমান বালি ও কাদা মিশানো থাকে তাহাকে **দোঁয়াশ মাটি** বলে।

মাটির উপাদান

বেলে মাটির সবটাই বালি নয়, ইহাতে কিছু কাদা মিশানো থাকে আর কাঁকরও থাকে; সেইরূপ কাদা মাটিতেও কিছু বালি মিশানো থাকে। কিন্তু সকল প্রকার মাটিতেই নানা রকম ধাতু দ্রব্যের লবণ, চুণ জাতীয় জিনিস, জল ও বায়ু থাকে; তবে সকল প্রকার মাটিতে সব জিনিস সমান থাকে না। সেই কারণে সব মাটিতে সব রকম গাছ ভাল জন্মে না। মাটির লবণ, জল ও বায়ু হইতে উদ্ভিদ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু সব উদ্ভিদের খাদ্য এক নহে। সেই কারণে দেখা যায়, যে কোন এক স্থানের মাটিতে কোন এক রকম ফসল ভাল না হইলে, সেই মাটিতে অন্যপ্রকার ফসল ভালই জন্মে।

এ'টেল মাটিতে ধান ভালই জন্মে, কিন্তু তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি ভাল জন্মে না। আবার বেলে মাটিতে তরমুজ, ফুটি ভালই জন্মে, কিন্তু ধান ভাল হয় না। এই কারণে ফসল ফলাইবার আগে কোন্ মাটি কোন্ ফসলের পক্ষে উপযোগী বুঝিয়া ফসল ফলানো উচিত।

মনে রাখিও বেলে মাটিতে ফুটি, তরমুজ, পটোল প্রভৃতি কয়েক রকম ফসল ছাড়া অন্য ফসল ভাল জন্মে না। এঁটেল মাটির উপর বর্ষাকালে ধান জন্মে আর কয়েক রকম শাক-সব্জী ফলে, কিন্তু শীতকালে ঐরূপ জমিতে কোনও ফসলই ভাল ফলে না। ঐ মাটি তখন শুকাইয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়।

ফসলের জন্য সব সময় দোঁয়াশ মাটিই ভাল। দোঁয়াশ মাটিতে বছরের সব সময়ে সব রকম ফসল ফলে।

সার

সব রকম মাটিতেই অল্প বিস্তর নানা রকম লবণ ও জল প্রভৃতি থাকে। ইহার ফলে মাটিতে স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি থাকে। কিন্তু যে জমি হইতে সর্বদা ফসল তুলিতে হইবে তাহাতে সার না দিলে ক্রমশঃ মাটি হইতে উদ্ভিদের খাদ্য কমিয়া যাইবে এবং ভাল ফসল ফলিবে না।

গোময় বা গোবর আমাদের দেশে বহুদিন হইতেই প্রধান সার হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু গোবর যেখানে সেখানে জমাইয়া রাখিলে বৃষ্টির জলে উহা হইতে অনেক সারাংশ ধুইয়া লইয়া যায়। রোদে শুকাইয়া গেলেও গোবর হইতে অনেক জিনিস উবিয়া যায়।

গোবরকে ভাল সারে পরিণত করিতে হইলে গোবর সংগ্রহ করিয়া এক গর্তে জমা করিতে হইবে। রোজ ঐ গর্তে গোবর রাখিয়া গর্তের মুখ একখানা টিন বা কাঠ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কয়েক মাস ঐভাবে গোবর জমাইয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। গর্তের উপর মাটি চাপা দেওয়ার ৩।৪ মাস পরে ঐ গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে। মহিষ, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর মলও ঐ ভাবে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যায়।

গো-মূত্র বা গোরুর চোনাকে সারে পরিণত করিতে হইলে গো-শালায় যেখানে গোরু বাঁধিয়া রাখা হয় তাহার পিছন দিকে একটি নালা কাটিয়া চোনা বাহির করিবার পথ করিয়া দিতে হইবে। ঐ চোনা বাহিরে যাহাতে একটা গর্তে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ গর্তে কিছু বালি ও মাটি রাখিতে হয়, ঐ বালি ও মাটি চোনা শোষণ করিবে। প্রায় ৬ মাস পর পর গর্তের নীচের মাটি সার হিসাবে ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মল-মূত্র হইতে সার প্রস্তুত করা—সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষের মলকে সারে পরিণত করা যায়। ফসলের ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে অল্প-গভীর গর্ত করিয়া প্রত্যেকটিতে ২।৩ সপ্তাহ মল ত্যাগ করিয়া মাটি ভরাট করিয়া রাখিতে হয়। ঐরূপ একটি ক্ষেতের সব দিকে অনেকগুলি গর্ত ভরাট হইয়া গেলে ৬ মাস পরে সাধারণভাবে চাষ করিয়া ঐ ক্ষেতে ফসল ফলানো যাইতে পারে।

পচা পাতার সার প্রস্তুত করা—পচা পাতা হইতে এক প্রকার সার হয়। মাটিতে লম্বা গর্ত কাটিয়া উহাতে গাছের সবুজ পাতা, কচুরিপানা প্রভৃতি ফেলিয়া মাটি চাপা দিতে হয়, পরে আর এক স্তর পাতা ফেলিয়া আবার মাটি চাপা দিতে হয়। এই ভাবে বর্ষার আগে গর্ত ভরিয়া রাখিয়া ৫।৬ মাস পরে শীতকালে গর্তের পচা পাতার সার ব্যবহার করা যায়। ইহাও ভাল সার।

রাসায়নিক সার—এই সকল ছাড়া বাজারে এমনিয়াম সালফেট, এমনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার কিনিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি মাটিতে মিশাইয়া দিলে সহজে উদ্ভিদ ঐগুলি শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়। সিন্ধ্রীতে ঐ প্রকার রাসায়নিক সারের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

সস্তা দরে ঐ সার কিনিয়া জমিতে মিশাইয়া আমাদের দেশের কৃষকগণ জমিতে অধিক ফসল ফলাইতে সক্ষম হইতেছেন।

মাটির ক্ষয়—আমাদের দেশে কোনও জমি হইতে বৃষ্টির জলে মাটি ধুইয়া লইয়া গেলেই আমরা বলি ঐ জমির মাটি ক্ষয় হইয়াছে। বৃষ্টির জলে মাটি গলিয়া গিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া খাল প্রভৃতি দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই ভাবে প্রতি বৎসর প্রত্যেক জমি হইতে অল্প অল্প করিয়া মাটি ক্ষয় হইতে থাকে, আবার স্থানে স্থানে পলি পড়িয়া মাটি উঁচুও হয়।

যে সব উঁচু জমি ঐ ভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় পায় তাহার উপর ঘাস লাগাইয়া দিলে উহা আর তত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইতে পারে না।

কিন্তু বাড়ীর উঠান বা বাগানে ঘাস লাগাইয়া রাখা চলে না। ঐ সকল স্থানে বরঞ্চ নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ক্রমে এই সকল স্থান নীচু হইয়া যায়। উঠান বা বাগান ঐভাবে নীচু হইয়া গেলে কয়েক বৎসর পরে মাটি দিয়া ভরাট করাইতে হইবে।

তিল তিল করিয়া মাটি যে ক্ষয় পায় তাহা নিবারণ করিবার উপায় নাই। পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে ঐ স্থানের বালি, মাটি প্রভৃতি ক্রমাগত ধুইয়া নদীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। ঐ মাটি নদীর উভয় তীরে স্থানে স্থানে পলিমাটি রাখিয়া যায় এবং অবশিষ্ট মাটি সমুদ্রে গিয়া পাললিক শিলা-স্তর সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী

১। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কয় প্রকার মাটি দেখা যায়? প্রত্যেক প্রকার মাটির বিশেষত্ব কি বল।

২। গোময় ও গো-মূত্রকে উপযুক্ত সার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে কি করা উচিৎ?

৩। পচা-পাতা হইতে কি ভাবে সার প্রস্তুত করা যায়?

৪। মাটির ক্ষয় বলিতে কি বোঝায়? কি ভাবে মাটির ক্ষয় হয় এবং উহাতে আমাদের কি অসুবিধা হয় বুঝাইয়া বল।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ

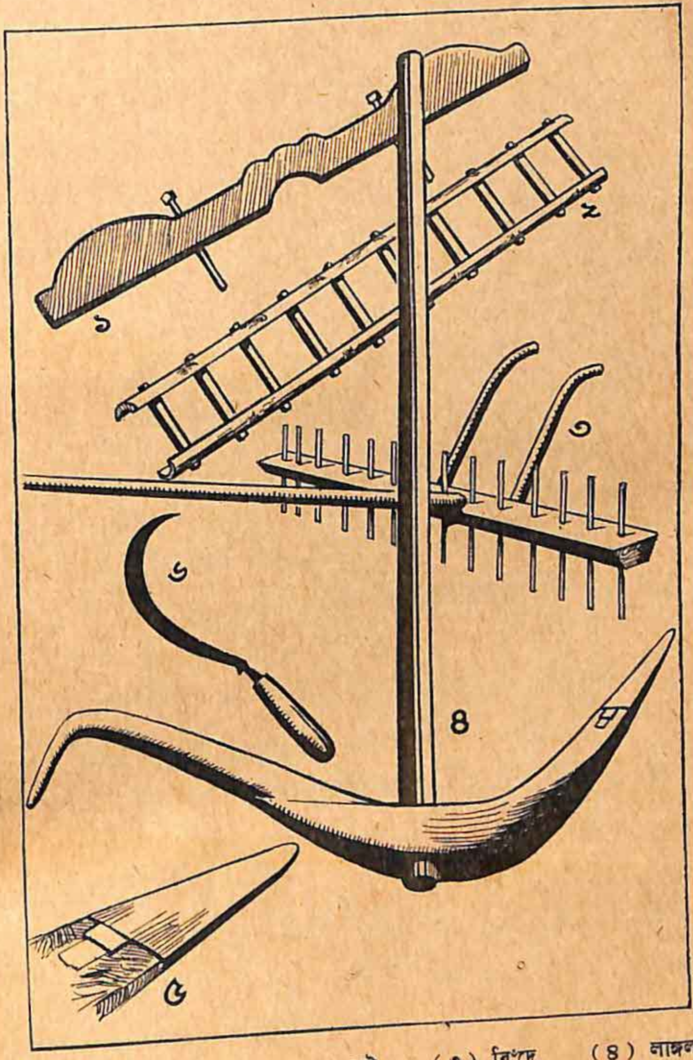
কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ

সাধারণতঃ যে জমিতে ধান ফলানো হয় তাহাকে **ধেনো জমি** বলে। ধান হইতে চাউল হয় আর ঐ চাল সিদ্ধ করিয়া ভাত রান্না করা হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। সুতরাং ধান কি ভাবে উৎপন্ন করা হয় তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। বই পড়িয়া এই সব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু নিজের চোখে ক্ষেত ও খামার দেখিয়া জমি চাষ সম্পর্কে যে জ্ঞান জন্মে বই পড়িয়া তাহা হয় না।

কৃষির কাজ দেখিতে হইলে জমি চাষ করিয়া যখন ধান বোনা হয় সেই সময় কিছুদিন মাঠে যাওয়া প্রয়োজন। মাঠে গেলে দেখিবে কোনও জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ হইতেছে, কোনও জমিতে মই দেওয়া হইতেছে; আবার কোনও জমিতে ধান বোনা হইতেছে অথবা জমির মাটি কাদা করিয়া তাহাতে গোছা গোছা ধানের চারা পোঁতা হইতেছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ধান বোনা হয়। তুমি যে অঞ্চলে বাস কর সেখানে যে যে ধানের চাষ হয় তাহার খোঁজ রাখিবে। বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রধানতঃ আমন ধানের চাষ করা হয়।

ধানের জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ হইয়া থাকে। একটা পুরু কাঠের বাঁকানো অংশের এক দিকে একটা হাতল ও অপর দিকে একটা লোহার ফাল আটকানো থাকে ইহাকে লাঙ্গল বলে। লাঙ্গলের মাঝখানটা একটা ঈষ বা লম্বা কাঠের সঙ্গে লাগাইয়া উহাকে জোয়ালের সঙ্গে আটকাইয়া



কৃষিযন্ত্র—(১) জোয়াল, (২) মই, (৩) বিঁদে, (৪) লাঙ্গল, (৫) ফাল, (৬) কাস্তে

দেওয়া হয়। যে দুইটি বলদ দিয়া হাল চাষ করা হয় তাহাদের ঘাড়ের উপর যে কাঠটি থাকে তাহাকে জোয়াল বলে। ইহার দুই প্রান্তে দুইটি কাঠি থাকে।

কৃষক লাঙ্গলের হাতলটি বাম হাতে ধরিয়া লাঙ্গলের ফালটিকে মাটিতে চাপিয়া রাখে। ডান হাতে একটি সরু লাঠি লইয়া বলদগুলিকে তাড়াইয়া ক্ষেতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে লইয়া যাওয়া হয়। তখন ফাল মাটির মধ্যে থাকিয়া মাটি খুঁড়িয়া ফেলে। এইভাবে জমির সব স্থান খোঁড়া হইয়া গেলেই জমি চষা হইল। এইভাবে দুই তিনবার ক্রমশঃ বেশী নীচে লাঙ্গলের ফাল ঢুকাইয়া মাটি গভীর ভাবে খুঁড়িয়া দিতে হয়।

পরে জমিতে মই টানা হয়। মই জোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া কৃষক মই-এর উপর দাঁড়াইয়া থাকে ও পাচন বাড়ি দেখাইয়া বলদগুলিকে মাঠের উপর তাড়াইয়া লইয়া যায়। ইহাতে মাটির বড় বড় ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় ও জমির তল সমান হয়। আর মই-এর সঙ্গে কিছু কিছু আগাছাও উঠিয়া আসে।

আগাছা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে বিঁদে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা একটি কাঠের চিরুণীর মত জিনিস। উহাকে জোয়ালের সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া যায়। ঐ বিঁদে খোঁড়া মাটির উপর চাপিয়া ধরিয়া বলদকে জমির উপর দিয়া তাড়াইয়া লইয়া গেলে মাটি আঁচড়াইয়া সব আগাছা উঠিয়া আসে।

এই সব ছাড়াও জমি চাষ আবাদ করিবার জন্য আরও নানা জিনিসের প্রয়োজন হয়। ধামা, কাস্তে, কোদাল, দড়ি, বাঁশ, মুগুর প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে লাগে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আউস ধান বোনা হয় এবং ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে উহা কাটা হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে আমন ধান বোনা হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস পর্যন্ত উহা কাটা হয়। আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত রবিশস্যের ফসল করা হয়। কৃষিক্ষেত্র দেখিতে গেলে আনন্দের সঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

পুষ্করিণী পর্যবেক্ষণ

গ্রামের পুকুর দেখিয়াও অনেক কিছু শিখিবার থাকে। পুকুর নানা রকমের হয়। সাধারণতঃ দীঘিগুলিতে পরিষ্কার টল্‌টলে জল থাকে। গ্রামের লোক ঐ পুকুর হইতে পানীয় জল লইয়া যায়। যে গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী সেই গ্রামে তাহারা ঐরূপ পুকুরে নামিয়া কাহাকেও স্নান করিতে দেয় না, অথবা বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি অন্য কাজ করিয়া জল দূষিত করিতে দেয় না।

কিন্তু কোন কোন গ্রামে একই পুকুরে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, গোরুর গা ধোওয়ানো প্রভৃতি সব কাজ চলে। আবার ঐ পুকুরের জলই পানের জন্য সকলে বাড়ীতে লইয়া যায়। ইহার ফলে ঐ সকল গ্রামে সহজে নানা প্রকার রোগ ছড়ায়।

স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা না করিয়াও পুকুরে অনেক কিছু দেখিবার ও শিখিবার আছে। পুকুরে ছোট বড় নানা রকম মাছ আছে। জল নাড়িবার ভঙ্গী ও শ্বাস লইবার কায়দা দেখিয়া অনেকে জলের নীচের মাছ চিনিতে পারে।

পুকুরে শোল বা ল্যাটা মাছের বাচ্চা হইলে দেখা যায় বাচ্চাদের আশে পাশে শোল বা ল্যাটা মাছটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক জাতীয় মাছের বাচ্চাকে অন্য জাতীয় মাছ সুযোগ পাইলেই খাইয়া ফেলে, মাছের মা তাই বাচ্চাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহার বাচ্চাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে।

অনেক পুকুরে আবার কল্‌মী, ঝাঁঝি দাম বা পানা দেখিতে পাওয়া

যায়। ঐগুলি জলজ উদ্ভিদ। ঝাঁঝি দাম দেখিলে উহা চিনিয়া রাখিবে। জলের নীচের অংশে ইহাদের পোকা ধরিবার জন্য এক ব্যবস্থা থাকে—জলচর পোকা একটা গুটির মত জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়া গেলে আর বাহিরে আসিতে পারে না। পোকাটিকে তখন ঐ গাছ হজম করিয়া ফেলে।



পানার মূলে মূলত্রাণ

পানার মূল তুলিলে মূলের সঙ্গে যে মূল-রোম ও মূল-ত্রাণ থাকে তাহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে মূল-ত্রাণ একটা টুপির মত জিনিস। সব গাছের মূলেই মূল-ত্রাণ থাকে, কিন্তু মাটি হইতে গাছ উপড়াইয়া আনিলে সাধারণতঃ মূল-ত্রাণ মাটিতেই থাকিয়া যায়। মূল মাটিতে ঢুকিবার কালে ঐ মূল-ত্রাণ ইহার আগার নরম অংশকে রক্ষা করে।

অনেক পুকুরেই কাঁকড়া, তেচোখা মাছ, চিংড়ি প্রভৃতি দেখা যায়। অনেক ডোবাতে গ্রীষ্মকালে ব্যাঙ ও ব্যাঙাচিও দেখা যায়। সেইরূপ সুযোগ পাইলে ব্যাঙের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবে।

অনুশীলনী

১। মাঠে চাষ করিতে হইলে কি কি কৃষিযন্ত্রের আবশ্যক হয়? কোন্‌টা কি কাজে লাগে সংক্ষেপে বল।

২। আমন ধান কখন বোনা হয় এবং কখন ইহার ফসল তোলা হয়?

৩। গ্রামের পুকুর দেখিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় বল।

৪। ঝাঁঝিদাম কিরূপে জলের কীট ধরে?

অষ্টম অধ্যায়

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (ক)

বায়ু

আমাদের চারিদিকে বায়ু বহিতেছে। এই বায়ুই আমাদের জীবন। খাদ্য গ্রহণ না করিয়া আমরা দুই এক সপ্তাহ বাঁচিতে পারি, জল পান না করিয়াও কয়েকদিন হয়তো বাঁচিতে পারি। কিন্তু বায়ু না থাকিলে আমরা কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারি না।

বায়ু প্রবাহ—বায়ু ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিতে থাকিলে আমরা উহাকে বায়ু প্রবাহ বা সাধারণ কথায় বাতাস বলি। আমাদের স্বাস্থের পক্ষে এই বাতাস নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা এক স্থানে বসিয়া থাকিলে আমাদের শরীরের চারি পাশের বায়ু গরম হইয়া যায়। বায়ুতে প্রবাহ থাকিলে ঐ গরম বায়ু সরিয়া যায় এবং নূতন ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আমরা আরাম বোধ করি।

আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা দূষিত বায়ু ত্যাগ করি। বায়ুর প্রবাহ না থাকিলে ক্রমশঃ আমাদের চারি দিকের বায়ু দূষিত হইয়া যাইবে। বায়ুর প্রবাহ থাকিলে এই দূষিত বায়ুকে সরাইয়া সব সময় বিশুদ্ধ বায়ু ঐ স্থান দখল করিবে। বায়ুর প্রবাহ আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক।

বায়ুর ধর্ম—বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, ইহাতে প্রবাহ থাকিলে বায়ু গাছের পাতা দোলাইয়া দেয় অথবা জোরে আমাদের গায়ে আসিয়া লাগে ; তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের চারিদিকে বায়ু আছে।

বায়ু গরম হইলে উপরে উঠিয়া যায়। একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া চিম্‌নীর কিছু উপরে ধূপ কাঠি রাখিলে দেখা যায় যে ধূপ কাঠির ধোঁয়া উপরদিকে উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে বোঝা যায় যে, বায়ু উপরে উঠিয়া যায়।

গরম বায়ু উপরে উঠিয়া গেলে যে স্থানটা খালি হয় উহাতে চারিপাশ হইতে বায়ু আসে। তখনই বায়ুতে প্রবাহ চলে।

আমরা ঘরের আবদ্ধ বায়ুতে বসিয়া থাকিলে আমাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত গরম বায়ু বাহির হয় তাহা উপরে উঠিয়া যায়। খোলা দরজা বা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তখন ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু উপর দিকে ফাঁক না থাকিলে গরম বায়ু ঘর হইতে বাহির হইতে পারে না। কাজেই বাহির হইতে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ুও আসে না, বরং উপরের দূষিত গরম বায়ু ঠাণ্ডা হইয়া নীচে আসে।

মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও উপকারিতা—যদি কোন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকে তবে ঐ ঘরে যাহারা থাকে তাহাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত বায়ু বাহির হয় তাহা ঐ ঘরে জমিয়া ঘরের সব বায়ুকে শেষ পর্যন্ত দূষিত করে। ইহার পরও যদি ঐরূপ আবদ্ধ ঘরে কেহ থাকিতে বাধ্য হয় তবে সে মরিয়া যাইবে।

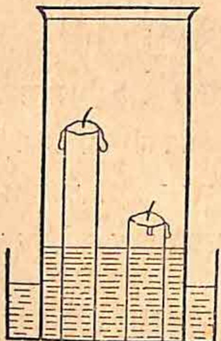
সুতরাং কেবল বায়ু থাকিলেই চলিবে না। আমরা যেখানে বাস করি সেখানে সর্বদা মুক্ত বায়ুর প্রবাহ আবশ্যক।

আমরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যে বায়ু দূষিত করি উদ্ভিদ তাহা অঙ্গারাত্মকরণের সময় শোধন করিয়া দেয়। সুতরাং মুক্ত বায়ু সাধারণতঃ বিশুদ্ধ থাকে। শ্বাসকার্য চালাইবার কালে আমরা যে বায়ু টানিয়া লই তাহা যত বিশুদ্ধ হইবে আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

খাদ্য গ্রহণ করিবার কালে আমরা বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি; জলপান করিতে হইলে আমরা বিশুদ্ধ জল পান করিতে চেষ্টা করি। কারণ বিশুদ্ধ খাদ্য আর বিশুদ্ধ জল না পাইলে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সেরূপ নিঃশ্বাস লইবার কালে আমরা যত বিশুদ্ধ বায়ু পাইব ততই আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।

মুক্ত বায়ু বিশুদ্ধ বলিয়াই উহা সেবন করা আমাদের শরীরের পক্ষে হিতকর।

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান—বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসীয় বস্তু মিশ্রিত আছে। অল্প পরিমাণ জলীয় বাষ্প এবং অতি অল্প পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান।


বায়ুর উপাদান পরীক্ষা

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় তাহা তোমরা জান।

প্রাণীর শ্বাসকার্যের ফলে বায়ুতে কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত থাকে। উদ্ভিদ ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অঙ্গারাত্মকরণ করিয়া বায়ুতে অক্সিজেন ফিরাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বায়ুতে সব সময় খুব অল্প পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকিয়া যায়।

বায়ুর অন্য দুই উপাদানের জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একটি পাত্রে দুইটি মোম বাতি জ্বালাইয়া বসাও এবং পাত্রের মধ্যে কিছুটা জল ঢালিয়া দাও। এখন একটা বেলজার উল্টাইয়া

মোম বাতিটি ঢাকিয়া দাও। দেখিবে একটু পরেই মোম বাতিটি নিভিয়া যাইবে এবং জারের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জল উঠিয়া যাইবে।

এই পরীক্ষা হইতে বোঝা যায় যে, বায়ুতে এমন এক জিনিস আছে যাহা মোমবাতিকে জ্বলিতে সাহায্য করে। বায়ুর ঐ জিনিসকে **অক্সিজেন** বলে।

বায়ুর অক্সিজেন নষ্ট হইয়া গেলে বায়ুতে যাহা থাকে তাহার নাম নাইট্রোজেন।

ঐ পরীক্ষায় মোম বাতি পুড়িয়া নিভিয়া যাইবার পর বোতলে যতটুক জল উঠে তাহার তুলনায় খালি জায়গা অনেক বেশী থাকে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের তুলনায় নাইট্রোজেন অনেক বেশী।

প্রকৃতপক্ষে বায়ুতে অক্সিজেনের তুলনায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৪ গুণ বেশী। বায়ুর অক্সিজেনই শ্বাসকার্যের সময় আমাদের শরীরে শোষিত হয় এবং উহাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে।

কিন্তু বায়ুর সবটাই এই অক্সিজেন হইলে আমাদের বাঁচিবার উপায় থাকিত না। তাহা হইলে আবশ্যক পরিমাণের অধিক অক্সিজেন আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং বায়ুর অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশিয়া থাকায় আমাদের উপকারই হইয়াছে।

দূষিত বায়ুর উপাদান—দূষিত বায়ুর কোন নির্দিষ্ট উপাদান থাকে না। নর্দমার ময়লা পচিয়া বায়ুকে দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিতে পারে, ইহাও দূষিত বায়ু। আবার যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া বায়ুকে দূষিত করিতে পারে। আর প্রাণীর

প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়াও বায়ুকে দূষিত করিতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত বায়ু, রোগ জীবাণুপূর্ণ বায়ু ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু দূষিত বায়ু।

দূষিত বায়ুর বিশোষন ও উহাতে বৃক্ষের কার্য—রৌদ্র এবং বৃষ্টির জলে রোগ জীবাণু মিশ্রিত বায়ু সর্বদা শোধিত হইতেছে।

আবদ্ধ ঘরের রোগ-জীবাণু-মিশ্রিত বায়ু শোধন করিতে হইলে ঘরে গন্ধক পোড়ানো প্রয়োজন। বসন্ত, হাম প্রভৃতি জীবাণু এই উপায়ে নষ্ট হয়।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়া যে বায়ু দূষিত হইয়াছে তাহা আমরা শোধন করিতে পারি না। ইহার জন্য আমাদিগকে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

তোমরা জান পাতার এক কাজ অঙ্গারাত্মকরণ। সূর্যের কিরণ পাতায় পড়িলে পাতার সবুজ কণা বায়ুতে মিশানো কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অঙ্গার শোষণ করিয়া লয় ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। এই উপায়ে গাছের পাতা গাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দূষিত বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে বায়ুতে অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। ইহাতে বায়ু শোধিত হইতেছে এবং প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভবপর হইয়াছে। উদ্ভিদ এই ভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়া না দিলে বহু আগেই বায়ুর সমস্ত অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যাইত।

জনসমাকীর্ণ ও রুদ্ধ গৃহের বায়ু—বহু লোক একত্র কোন আবদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকিলে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। সকলেই শ্বাসকার্য চালাইয়া বায়ুর অক্সিজেনকে ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত

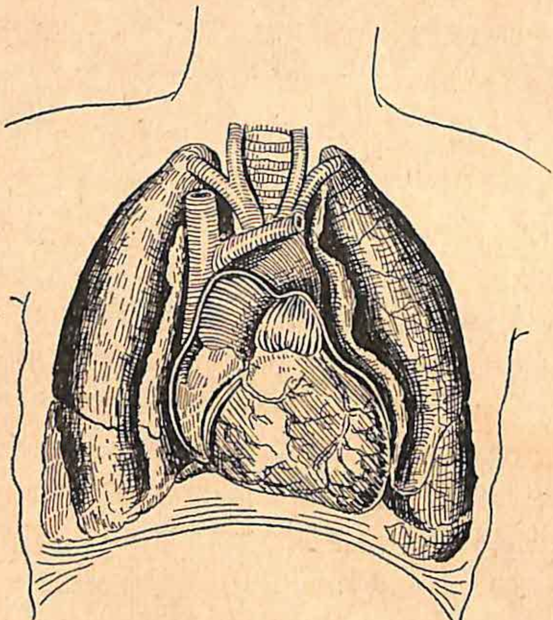
করিতে থাকিবে। ঐ দূষিত গরম বায়ু প্রথমে উপরে উঠিয়া যাইবে; কিন্তু উপর দিকে বাহির হইতে না পারিলে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসিবে। ধীরে ধীরে ঘরের বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। কারণ আমাদের নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে সর্বদাই জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। লোকের তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইবে এবং ঐ ঘরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হেতু শরীরে ঘাম জমিয়া অস্বস্তি বোধ হইবে; সকলে বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে—শীতের দিন হইলেও লোকে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মুক্ত বায়ুতে শ্বাস লইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিবে।

একেবারে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐরূপ ঘরে থাকিলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে।

বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী—ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখা এবং ঘরের উপরের দিকে ফোকর রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা তোমরা বুঝিতেছ। উপরে ফোকর থাকিলে গরম দূষিত বায়ু ঐদিকে বাহির হইয়া যাইবে এবং জানালা দরজা খোলা থাকিলে মুক্ত বায়ু ঘরে প্রবেশ করিবে। সুতরাং আমাদের শ্বাসকার্যের জন্য আমরা সর্বদা বিশুদ্ধ বায়ু পাইব।

যে ঘরে উপরে ফোকর রাখা হয় নাই বা ঘরের দেওয়ালে কোন ছিদ্র নাই সেই ঘরে জানালা বা দরজার উপর দিক দিয়া বায়ু বাহিরে চলিয়া যায় এবং নীচু দিক হইতে বায়ু ভিতরে আসে। ঐরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়—ঘরের উপর দিকে ফোকর রাখাই ভাল। ঘরের দেওয়ালের উপর দিকে ফোকর থাকিলেই চলে না; রাত্রে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঐরূপ ঘরে ঘুমাইলেও ঘরে ভাল বায়ু-চলাচল হইতে পারে না। হয়তো জানালা বা দরজার ফাঁক দিয়া অতি সামান্য বায়ু ধীরে ধীরে ঘরে আসে এবং উপর দিক দিয়া গরম বায়ু বাহির হইয়া যায়।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে হঠাৎ কাহারো কোন ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু বেশীদিন ঐ ভাবে ঘুমাইলে স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে পারে। যদি ঘর খুব বড় হয় এবং তাহাতে মাত্র ২।১ জন লোক ঐ ভাবে ঘুমায় তবে বিশেষ কোনও ক্ষতি না হইতে পারে। তথাপি সম্ভব হইলে জানালা খুলিয়া রাখিয়া ঘুমানোই ভাল।



ফুস্‌ফুস্‌ ও মধ্যচ্ছদা

শ্বাস প্রশ্বাসের প্রণালী—আমাদের বুক ও পেটের মাঝখানে একখানা পর্দা আছে। উহাকে **মধ্যচ্ছদা** বলে। আমরা যখন শ্বাস টানি তখন ঐ পর্দাখানা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ও বক্ষপিঞ্জর উপর দিকে ফুলিয়া উঠে। তখন ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু ঢুকিয়া যায়। ঐ বায়ু ফুস্‌ফুসের অসংখ্য বায়ুস্থলীর মধ্যে ঢুকিয়া বায়ুস্থলীগুলিকে ফুলাইয়া তোলে।

একটু পরেই আবার মধ্যচ্ছদাখানা উপর দিকে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরার হাড় নীচের দিকে নামে। এই চাপে ফুস্ফুস্ হইতে বায়ু বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ফুস্ফুসের বায়ুস্থলী হইতে রক্তের মধ্যে অক্সিজেন মিশিয়া যায় এবং রক্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুস্থলীতে চলিয়া আসে। বায়ুস্থলীর উপরে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নল আছে। হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া দূষিত রক্ত যখন ঐ নলের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে তখন বায়ুস্থলীর পাতলা পর্দার ভিতর দিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুস্থলীতে আসিতে পারে এবং অক্সিজেন গিয়া রক্তের সহিত মিশিতে পারে। এই কারণেই আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি।

বায়ুতে যত বেশী অক্সিজেন থাকিবে ততই বেশী অক্সিজেন রক্তে মিশিয়া দূষিত রক্ত সহজে শোধিত হইবে। এই জন্যই আমরা সর্বদা মুক্ত বায়ুতে শ্বাস টানিয়া আরাম পাই।

অনুশীলনী

১। আমাদের স্বাস্থ্যের সহিত বায়ু-প্রবাহের সম্বন্ধ কি?

২। বায়ুর কোন্ কোন্ ধর্মের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে বুঝাইয়া বল।

৩। মুক্ত বায়ু বলিলে কি বোঝায়? মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও উপকারিতা কি?

৪। বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান কি কি? বায়ুর সবটাই অক্সিজেন হইলে আমাদের উপকার না অপকার হইত?

৫। দূষিত বায়ু বলিলে কি বোঝায়? কিভাবে উহা উদ্ভিদ দ্বারা শোধিত হয়?

৬। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলে কি অসুবিধা হয়?

৭। ঘরে বায়ু চলাচলের জন্য কি ব্যবস্থা রাখা উচিত?

৮। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালী বর্ণনা কর।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (খ)

জল

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বায়ু আমাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বায়ুর পরেই যে জিনিস আমাদের আবশ্যক তাহা জল। বায়ু না হইলে আমরা কয়েক মিনিটের বেশী সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারি না ইহা সত্য। কিন্তু বায়ু থাকিলেও জল না পাইলে আমরা কয়েক দিনের বেশী সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। পৃথিবীতে বায়ু ও জলের অভাব নাই বলিয়াই পৃথিবী প্রাণীর পক্ষে বাসের যোগ্য হইয়াছে।

জলের ধর্ম—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে জলের যে সব ধর্ম আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল তাহার মধ্যে কয়েকটি তোমাদিগকে বলিতেছি।

(১) জল প্রাণীর তৃষ্ণা নিবারণ করে। প্রাণীর শরীর হইতে নিশ্বাসের সঙ্গে এবং মলমূত্রের সঙ্গে সর্বদা জল বাহির হইয়া যাইতেছে। এই কারণে প্রাণীর তৃষ্ণা পায় এবং প্রাণী জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ক্ষুধায় প্রাণী যত কাতর হয় তৃষ্ণায় তাহা অপেক্ষা কম কাতর হয় না। জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলে প্রাণীর শরীর সুস্থ হয় এবং প্রাণী শরীরে নূতন বল পায়।

(২) জল প্রায় সব জিনিসকেই ভিজাইয়া দেয় এবং অনেক জিনিসকে দ্রবীভূত করিতে পারে।

সেই কারণে আমরা জল দিয়া ধুইয়া বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করিতে পারি, স্নান করিয়া শরীরের ময়লা দূর করিতে পারি এবং কাপড়-চোপড় ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে পারি।

(৩) জলের মধ্যে নানারূপ প্রাণী ও জীবাণু বাঁচিয়া থাকিতে পারে। জলে যে সব প্রাণী বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মাছ আমাদের পক্ষে খুব পুষ্টিকর খাদ্য।

কিন্তু জলে অনেক প্রকার রোগের জীবাণু বাঁচিয়া থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের ভীষণ তৃষ্ণার সময়ও যে-কোন জল পান করা উচিত নয়। জলের ব্যবহার সম্পর্কে এই কারণে আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকিতে হয়। কারণ যে জলে রোগের জীবাণু থাকে সেই জল পান করিলে আমাদের রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য জলকে শোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৪) জল ঢালুর দিকে গড়াইয়া চলে—ইহার ফলে বাড়ীর নালা কাটিয়া আমরা বাগান বা বাড়ীর জল সহজে নিষ্কাশন করিয়া বাসস্থান স্বাস্থ্যকর রাখিতে পারি।

ইহা ছাড়া জল স্বচ্ছ, সহজে বাষ্প হয় এবং বাষ্প অল্প ঠান্ডায় আবার জলকণায় জমিয়া যায়।

উদ্ভিদ্, পশু ও মানব জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা—জল যে শুধু প্রাণীর বাঁচিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা নহে, উদ্ভিদের বাঁচিবার পক্ষেও জল নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তোমরা জান উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা মাটি হইতে রস শোষণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। মাটিতে যে সার থাকে তাহা জলে গলিয়া তরল না হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা শোষণ করিতে পারেনা। সুতরাং উদ্ভিদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জলের, নিতান্ত আবশ্যক।

শুধু তাহাই নয়, জল না হইলে বীজ হইতে কোন উদ্ভিদ্ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। বীজ জলে না ভিজিলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। আমরা দেখি বর্ষাকালে যেখানে সেখানে চারা গজায়, কিন্তু

শীতকালে বড় গাছ ছাড়া ঘাস জাতীয় সব গাছ মরিয়া যায়। বর্ষার জলে নানা রকম বীজ সহজে অংকুরিত হইয়া গাছ জন্মে। কিন্তু যে সকল গাছের শিকড় মাটির নীচে বেশী দূর পর্যন্ত যাইতে পারে না সেইরূপ গাছ শীতকালে মাটি শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়।

আমাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রত্যেকটির অল্প-বিস্তর জলের আবশ্যক হয়। বিড়াল জল পান করে, কিন্তু স্নান করিতে চায় না। অন্য সব প্রাণী জল পান তো করেই তাহা ছাড়া স্নান করাইয়া দিলে খুব আরাম পায় এবং ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই জন্য লোকে গৃহপালিত কুকুর, গোরু, মহিষ প্রভৃতিকে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া দেয়।

বনের পশুও জঙ্গলের মধ্যের জলাশয় হইতে জল পান করে। জল-হস্তী ও মহিষ অধিকাংশ সময় জলে গা ডুবাইয়া রাখিতেই ভালবাসে। হাতী তাহার শুঁড় দিয়া সর্বাঙ্গে জল ছিটাইয়া দেয়। বাঘ, সিংহ প্রভৃতিও তৃষ্ণার সময় জল পান করিবার জন্য পাহাড় জঙ্গল হইতে নিকটস্থ জলাশয়ে নামিয়া আসে।

আগেই বলিয়াছি সকল প্রাণীর শরীর হইতে নিশ্বাস, মল, মূত্র, ও ঘামের সঙ্গে প্রত্যহ প্রচুর জল বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য শরীরের জল কমিয়া গেলে প্রাণীর তৃষ্ণা পায়।

স্নান এবং পান ছাড়াও মানুষ নানা কাজে জল ব্যবহার করে। জল না হইলে আমাদের রান্না হয় না। ঘর-দোর ধুইয়া-মুছিয়া বা লেপিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইলে আমাদের জল চাই ; কাপড়-চোপড় সাবান সোডা দিয়া পরিষ্কার করিতে আমাদের জলের আবশ্যক। আমাদের যদি জলের তৃষ্ণা না পাইত তথাপি সভ্য ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্যই আমাদের যে প্রচুর জল লাগিত তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। প্রকৃতপক্ষে আমরা পানের জন্য খুব অল্প জলই

ব্যবহার করি—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্যই পানীয় জলের তুলনায় বহুগুণ বেশী জল ব্যবহার করি।

বিশুদ্ধ ও দূষিত জলের উপাদান—বিশুদ্ধ জলে জল ব্যতীত আর কোন পদার্থ থাকে না, এই কথা মনে রাখিলেই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিশুদ্ধ জলের উপাদান বলিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ঐ দুই গ্যাসকে বোঝায়, কারণ ঐ দুই গ্যাস একত্র মিলিয়া উহাদের নিজ নিজ ধর্ম বা গুণ হারাইয়া একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম বা গুণ পাইয়া জলে পরিণত হয়। তোমরা জান নানারকম জিনিস জলে দ্রবীভূত থাকিতে পারে এবং রোগের জীবাণু জলের মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। ঐরূপ জল বিশুদ্ধ নহে।

কোনও নির্দোষ বস্তু জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলেও বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহা বিশুদ্ধ নহে। কিন্তু জলে যে জিনিস দ্রবীভূত থাকে তাহা খাইলে যদি স্বাস্থ্য খারাপ না হয় এবং জলে কোন জীবাণু না থাকে তবে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে আমরা উহাকে বিশুদ্ধ পানীয় জল বলিয়া থাকি।

জল নানা কারণে দূষিত হয়। সাধারণতঃ যদি জলে এমন কোন জিনিস দ্রবীভূত থাকে যাহা খাইলে আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা যদি জলে কোন রোগের জীবাণু থাকে তবে উহাকে **দূষিত জল** বলা হয়।

দূষিত জলের দ্বারা সংক্রমিত ব্যাধি—কলেরা, টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর এবং আমাশয় এই কয়েকটি রোগের জীবাণু জলের মধ্যে বাঁচিতে পারে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং পানীয় জলের পুকুর, কূপ প্রভৃতিতে ঐ সকল রোগের জীবাণু কোন কারণে মিশিয়া গেলে ঐ জল পান করিয়া সুস্থ লোক পীড়িত হয়। এই ভাবে জলের মধ্য দিয়া ঐ সকল রোগ সংক্রমিত হইতে থাকে এবং ক্রমে অধিক লোক ঐ রোগে

পীড়িত হয়। যাহারা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করে তাহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন রোগীর মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদির দ্বারা কোন জলাশয়ের জল দূষিত না হয়।

যাহাতে সাধারণের ব্যবহারের জলাশয় প্রভৃতিতে কোনও ক্রমে রোগের জীবাণু না মিশিতে পারে সেই দিকে গ্রামের সকলের, বিশেষ ভাবে রোগীর বাড়ীর লোকের, খুব সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর মল-মূত্র পড়িয়া যে সকল জিনিস নোংরা হইয়াছে তাহা কখনও কোন জলাশয়ে ধোওয়া উচিত নহে।

ঐ রকম কোন রোগ পাড়ায় বা গ্রামে হইতে আরম্ভ হইলে জল ফুটাইয়া পান করিলে জল দ্বারা ঐ সকল রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না। জল কিছু বেশী সময় ফুটাইলে জলের মধ্যের সব জীবাণু মরিয়া যায়।

গ্রামের কূপ, পুষ্করিণী ও নদীর জল বিশোধনের প্রণালী

গ্রামের কূপ, পুষ্করিণী বা নদী, যেখান হইতেই জল আনা হউক না কেন **তোলা জলকে** বিশোধনের সবচেয়ে সহজ উপায় ঐ জলে ফট্‌কিরি দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তারপর ফুটাইয়া লওয়া। জল ফুটাইলে উহার মধ্যের জীবাণু মরিয়া যায় সুতরাং ঐ জল হইতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না।

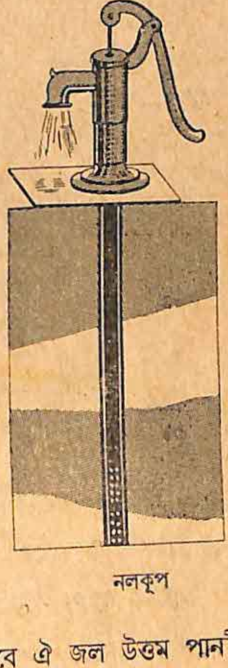
কিন্তু জলে নানারূপ ময়লা থাকিলে ঐগুলি পেটে গেলে হজমের গোলমাল হইয়া পেটের অসুখ হইতে পারে। জলে ফট্‌কিরি দিলে জল যখন থিতাইয়া যায় তখন জলের সব ময়লা তলানি হইয়া নীচে জমা হয়। উপরের জল ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। ঐ জল ফুটাইয়া পান করিলে তাহা হইতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে না।

কূপ বা পুষ্করিণীর মধ্যস্থ জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে জলে পরিমাণ

মত চূর্ণ ফেলিয়া পটাশ পারমাঙ্গানেট নামক এক প্রকার ঔষধ জলে গুলিয়া দিতে হয়। কয়েক দিন পর ঐ জল ব্যবহার করা যায়।

পুষ্করিণীর চারিপাশে গাছ থাকিলে পুষ্করিণীর জল ভাল থাকে না। গাছ কাটিয়া পুকুরের জলে সারাদিন রোদ লাগিবার ব্যবস্থা করিলে সূর্যকিরণে পুকুরের জলের জীবাণু নষ্ট হয়। পুকুরের জল বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিতে হইলে চারিদিকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয় এবং কপিকলের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট বাল্‌তি ডুবাইয়া সকলের পানীয় জল তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নলকূপ—মাটির নীচে স্তরে স্তরে জল আছে। বৃষ্টির জল মাটির ভিতর দিয়া নীচে চুঁয়াইয়া যাইতে থাকে কিন্তু বালির গভীর স্তর ভেদ করিয়া গেলে ঐ জলে জীবাণু থাকে না। আর বালির স্তরের নীচে যেখানে শক্ত পাথরের স্তর থাকে জল সেইখানে ঐ দুই স্তরের মধ্যে আবদ্ধ হয়। কারণ পাথরের ভিতর দিয়া জল নীচে যাইতে পারে না।



নলকূপ

নল বসাইয়া উপর হইতে পাম্প করিয়া বালির নীচের স্তর হইতে জল আনিবার ব্যবস্থাকে নলকূপ বলে। নলকূপের জলে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কোন লবণ ইহাতে থাকিতে পারে। সুতরাং জল পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে উহাতে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কোন লবণ নাই তবে ঐ জল উত্তম পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

খর ও মৃদু জল

অনেক নলকূপ বা গভীর কূপের জল লইয়া সাবান গুলিলে দেখা যায় যে, জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। অনেক সাবান ক্ষয় হওয়ার পর জলে সাবানের ফেনা হয়। ঐরূপ জলকে **খর-জল** বলে। জলে কয়েক জাতীয় লবণ দ্রবীভূত থাকিলে জল খর-জল হয়।

খর-জল দুই প্রকার—স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী খর-জলকে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই মৃদু জল হয়। আর স্থায়ী খর-জলকে মৃদু-জল করিতে হইলে কাপড় কাচার সোডা অথবা চূণ মিশাইয়া ফুটাইতে হয়।

অনুশীলনী

১। জলের কোন্ কোন্ ধর্মের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে বুঝাইয়া বল।

২। উদ্ভিদ, পশু ও মানুষের জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা সংক্ষেপে বল।

৩। গ্রামের কূপ, পুকুর ও নদীর জল বিশোধনের প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। খর ও মৃদু জল কাহাকে বলে?

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (গ)

কয়েকটি ব্যাধি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

ম্যালেরিয়া

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া একটি অতি সাধারণ রোগ; এমন লোক বাংলাদেশে কমই আছে যাহার জীবনে কখনও ম্যালেরিয়া হয় নাই।

রোগের লক্ষণ—ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইলে সাধারণতঃ কম্প দিয়া জ্বর আসে, অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বর খুব প্রবল হয়। জ্বর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর জল পিপাসা হয়, কেহ কেহ বমি করে আর

কাহারও কাহারও খুব মাথা ব্যথা হয়। সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের ভোর বেলা ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। কোন চিকিৎসা না করাইলে প্রায়ই ঐরূপ জ্বর হইতে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীর প্লীহা বড় হইয়া পেট মোটা হয় এবং হাত-পা সরু হইতে থাকে। শীঘ্রই শরীরে রক্ত-হীনতা দেখা দেয় এবং ঐ রোগেই দুর্বল হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যায়।

রোগের কারণ—ম্যালেরিয়া রোগের একপ্রকার জীবাণু আছে। ঐ জীবাণু মশার কামড়ের সঙ্গে কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীরের রক্তে মিশিয়া গেলে তাহার ঐ রোগ হয়।

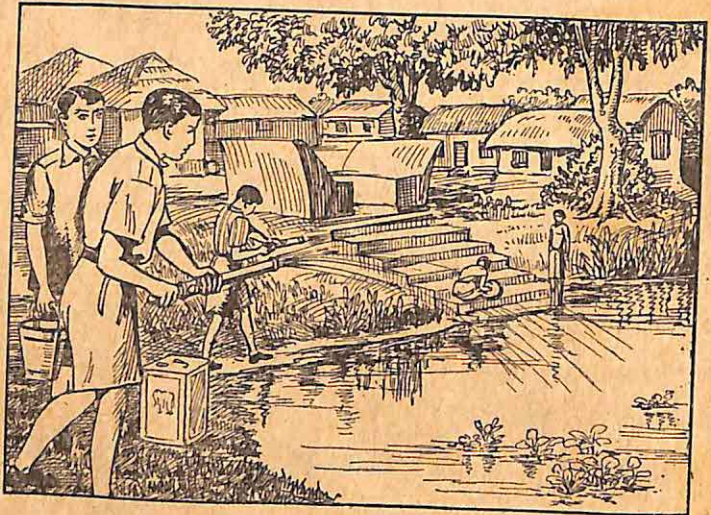
এ্যানোফিলিস মশার কথা তোমরা আগেই পড়িয়াছ। স্ত্রী-**এ্যানোফিলিস** মশা কোনও ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইলে রোগীর শরীর হইতে রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার শরীরে চলিয়া যায়। মশার শরীরের মধ্যে কয়েক দিন থাকিয়া ঐ জীবাণুগুলির আকৃতি পরিবর্তিত হয় ও বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহার পর ঐ জীবাণু মশার মুখের ধারে আসিয়া অপর লোকের শরীরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মশা তখন কোন সুস্থ লোককে কামড়াইলে জীবাণুগুলি সুস্থ ব্যক্তির শরীরের মধ্যে আসে।

চিকিৎসা—রোগীকে রীতিমত কুইনিন খাওয়াইলে অথবা কুইনিন ইনজেক্‌শন দিলে ম্যালেরিয়া সারিয়া যায়। জ্বর থাকা অবস্থায় কুইনিন খাইলে বিশেষ উপকার হয় না। জ্বর ছাড়িয়া গেলে পরিমাণমত কুইনিন খাইলে ঐ জীবাণুগুলি মরিয়া যায়।

কুইনিন ছাড়া ম্যালেরিয়ার অন্য কোন ভাল ঔষধ নাই; সুতরাং রোগ ম্যালেরিয়া বলিয়া সঠিক জানা গেলে পাঁচরকম চিকিৎসা করাইয়া সময় ও অর্থ নষ্ট না করিয়া কুইনিন খাওয়া উচিত।

রোগ প্রতিরোধ করা—ম্যালেরিয়া যাহাতে না হয় সেজন্য সাবধান হইতে হইলে প্রত্যেকের মশারির মধ্যে ঘুমানো উচিত এবং কাহারও ম্যালেরিয়া হইলে তাহাকে মশারির মধ্যে রাখা উচিত।

সাধারণতঃ বর্ষাকালের পর ঐ রোগ বেশী হয়। কারণ বর্ষাকালে সর্বত্র জল জমে এবং মশার ডিম পাড়ার সুবিধা বেশী থাকে। ঐ সময়ে যে সকল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয় সেই সকল অঞ্চলের লোকদের সপ্তাহে অন্ততঃ এক বড়ি কুইনিন বা প্যালুড্রিন খাওয়া উচিত।



মশা নষ্ট করিবার জন্য পুকুরের জলে কেরোসিন দেওয়া

সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া গ্রামের যে সকল ডোবার মধ্যে ঘাস ও জল জমিয়া থাকে সেইগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং অন্য যে স্থানের জল নিকাশ হয় না সেই স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ করিয়া মশার বংশ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা উচিত।

যে সকল পুকুর বা ডোবা বন্ধ করা সম্ভবপর নহে সেইগুলির জলের উপর সপ্তাহে একদিন করিয়া কেরোসিন তেল পিচকারী করিয়া ছিটাইয়া দিলে মশা-শূককীট শ্বাস টানিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে। ঘরের অন্ধকার কোণে, অথবা বাহিরে যেখানে মশা থাকে সেই স্থানে ডি, ডি, টি, মিশ্রিত কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিলে মশা (এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গও) মরিয়া যায়।

যে সকল পুকুরে কেরোসিন দেওয়া চলে না সেইগুলিতে প্রচুর তেচোখা, খলিসা, ফলুই প্রভৃতি ছোট মাছের চাষ করিলে ঐ মাছেরা মশার শূককীটগুলি খাইয়া শেষ করিবে।

কলেরা

কলেরা রোগে লোক হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং দুই একদিনের মধ্যেই হয় রোগ ভাল হয় নতুবা রোগী মরিয়া যায়। সাধারণতঃ এক পাড়ায় বা গ্রামে এক সঙ্গে বহু লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক লোক ঐ রোগে কয়েক দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এইরূপ রোগের বিস্তারকে **মহামারী** বলে।

রোগের লক্ষণ—ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে লোকের বারবার বমি ও দাস্ত হইতে থাকে। প্রথম কয়েকবার বমি ও দাস্তের পর রোগীর দাস্ত বা বমির সঙ্গে চাল ধোওয়া জলের মত তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে।

ধীরে ধীরে রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। শেষে হাত ও পা মোচড়াইতে থাকে এবং পরে রোগী মরিয়া যায়।

রোগের কারণ—এই রোগেরও জীবাণু আছে। এই জীবাণু সুস্থ লোকের পেটে গেলে সুস্থ লোকটিরও কলেরা হয়।

মাছি এই রোগের বাহন। কলেরা রোগীর বমি, দাস্ত প্রভৃতির উপর মাছি বসিয়া যখন আবার কোন খাদ্যদ্রব্যে বসে তখন মাছির পায়ের লোম

হইতে কলেরার জীবাণু খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়া যায়। ঐ খাদ্য খাইয়া লোক পীড়িত হয়। কোন কলেরা রোগীর বমি বা দাস্তের দ্বারা যে সকল কাপড়-চোপড় নোংরা হইয়াছে তাহা যদি কোন পুকুরের জলে ডুবাইয়া ধোওয়া হয় তবে ঐ পুকুরের জলে ঐ জীবাণু বাঁচিয়া থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং ঐ পুকুরের জল পান করিলে কলেরা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অর্থাৎ পানীয় জল ও খাদ্যের ভিতর দিয়া কলেরার জীবাণু যখন সুস্থ ব্যক্তির পেটে যায় ও তখন তাহার কলেরা হয়।

কলেরা রোগীর বমি ও দাস্তের মধ্যে কোটি কোটি কলেরার জীবাণু এবং জল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। শরীরের সমস্ত জলীয় অংশ শোষণ করিয়া ঐ জীবাণু নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। রক্তের জলীয় ভাগ কমিয়া গেলে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হইয়া যায় ও রোগী মারা পড়ে।

চিকিৎসা—কলেরা রোগীকে যত ইচ্ছা জল খাইতে দিতে আপত্তি নাই। প্রচুর জল খাইয়া কোন কোন রোগী বাঁচিয়া যায়।

ডাক্তার সাধারণতঃ লবণের জল হাতের শিরার ভিতর দিয়া শরীরে চালাইয়া দেন, ইহাকে **স্যালাইন** ইন্‌জেক্‌শন বলে। ঐ ইন্‌জেক্‌শন দিলে রোগীর শরীরে সহজে জলের অভাব হয় না এবং চিকিৎসা করিবার সময় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা উপযুক্ত ঔষধ দিয়া জীবাণুকে নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করেন।

প্রতিরোধের উপায়—পানীয় জল ফুটাইয়া খাইলে এবং খাদ্যদ্রব্যে মাছি যাহাতে বসিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে সাধারণতঃ এই রোগ হয় না।

পাড়ায় কলেরা হইতে আরম্ভ হইলে ঘর-বাড়ী ফিনাইল দিয়া

পরিষ্কার রাখা আবশ্যক এবং ঐ সময়ে কলেরার ইন্‌জেক্‌শন লওয়া উচিত। কলেরার ইন্‌জেক্‌শন লইলে ৬ মাসের মধ্যে কলেরা হয় না।

আন্ত্রিক জ্বর

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড একটি মারাত্মক রোগ। ইহারও জীবাণু আছে।

রোগের লক্ষণ—আন্ত্রিক জ্বর হইলে যে দিন জ্বর উঠে সেই দিনই প্রবল জ্বর হয়, আর জ্বর ১০২ ডিগ্রি বা ১০৩ ডিগ্রির কম হয় না। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে জ্বর একবারও কমে না। পাঁচ সাত দিন পরে এমন কি কখন কখন তার আগেই মুখের ভিতরের চামড়ায় ঘা দেখা যায়। কখন কখন রোগীর জ্বর আরো বাড়ে এবং রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। কোন কোন রোগীর ঐ সময়ে দাস্ত হইতে আরম্ভ করে এবং দাস্তের সহিত রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়।

রোগের কারণ—এই রোগের জীবাণু মানুষের পেটের ভিতরের নাড়ী বা ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের ভিতরের দিকে বাসা বাঁধে। ঐ জীবাণু অন্ত্রের ভিতরের দিকে ঘা করিয়া ফেলে। ক্রমে মুখের ভিতরের পাতলা পর্দায় পর্যন্ত ঘা হইয়া যায়। রোগ কিছু দিনের মধ্যে না সারিলে অন্ত্রের দেওয়াল ছিদ্র হইয়া যায় এবং রোগী মরিয়া যায়।

রোগের বিস্তার—কলেরার জীবাণু যে ভাবে মাছি দ্বারা ও পানীয় জলের মধ্য দিয়া বিস্তার লাভ করে আন্ত্রিক জ্বরও সেইরূপ এই দুই উপায়ে বিস্তার লাভ করে।

সুতরাং কলেরার সময় যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এ ক্ষেত্রেও তাহাই কর্তব্য।

চিকিৎসা—কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও এই রোগের ভাল চিকিৎসা কিছু ছিল না। মাথায় বরফ চাপা দিয়া রাখা অথবা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা জল

ঢালা, রোগীকে প্রচুর জল খাওয়ানো ও অন্য রোগে যাহাতে রোগী আক্রান্ত না হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত শুশ্রূষা করিলে কোন কোন রোগী ভাল হইত।

কিন্তু আজকাল ক্লোরোমাইসিটিন নামক এক নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। ঐ ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়াইলে অনেক সময় রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু তাই বলিয়া সেবা যত্ন যে কম আবশ্যক তাহা নয়।

রোগ প্রতিরোধ—এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ফুটানো জল ব্যবহার করা এবং খাদ্য দ্রব্যে মাছি যাহাতে না বসিতে পারে তাহা দেখা উচিত।

এই রোগ প্রতিরোধের জন্য পূর্বেই ইন্‌জেক্‌শন লওয়া চলে।

বসন্ত

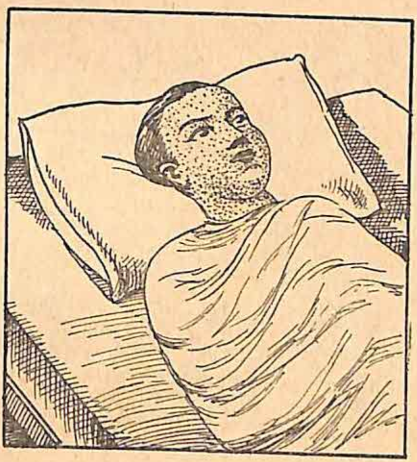
বসন্ত আমাদের দেশে মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসন্ত ঋতুর প্রথম দিক হইতে বর্ষাকাল পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপ থাকে।

রোগের লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমে সমস্ত শরীরে ভীষণ বেদনা করে ও ক্রমে প্রবল জ্বর হয়। দুই তিন দিন পরে মুখ ও হাতের চেটোতে খুব ছোট ছোট লাল লাল মসুরীর দানার মত গুটি দেখা দেয়। ক্রমে সর্ব শরীর ঐ গুটিতে ভরিয়া যায়। পরে ঐগুলি পাকিতে আরম্ভ করে। তখন অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা হয়। অনেক রোগী ঐ সময়ে মরিয়া যায়।

রোগের কারণ—এই রোগেরও জীবাণু আছে। বসন্ত রোগীর ঘা শুকাইবার কালে সাধারণতঃ ঐ রোগের জীবাণু বায়ুতে ভাসিয়া

বেড়াইতে আরম্ভ করে। তখন ঐ জীবাণু যাহার শরীরে প্রবেশ করে তাহার ঐ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রোগসংক্রমণ—রোগীর ঘা বা পুঁজের উপর মাছি বসিয়া ঐ রোগের জীবাণুকে নানা স্থানে ছড়াইয়া দেয়। ঐ জীবাণু বায়ুতে ভাসিতে পারে।



বসন্তরোগী

সেই কারণে এক রোগীর ঘা শুকাইবার সময় উহার শরীর হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মরা চামড়ার সহিত ঐ জীবাণু বাতাসে উড়িয়া যায় ও সুস্থ ব্যক্তির প্রশ্বাসের সহিত জীবাণু উহার শরীরে প্রবেশ করে।

চিকিৎসা—এই রোগের খুব ভাল চিকিৎসা কিছু নাই বলিলেই চলে। প্রথম অবস্থায় মেথির জল পান করাইলে গুটি বাহির হইয়া যায় এবং পরে নিম পাতার জল দিয়া ঘা ধুইয়া দিয়া ঘায়ের উপর সাধারণতঃ শ্বেত চন্দন লেপিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক রোগী ভাল হইয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ—বসন্তের টিকা লইলেই এই রোগের আক্রমণ সব চেয়ে সহজে প্রতিরোধ করা যায়। শীতকালে বসন্তের টিকা লইলে সাধারণতঃ ঐ রোগ হয় না।



বসন্তের টিকা

পাড়ায় ঐ রোগ হইলে মশারির মধ্যে শোওয়া এবং বাড়ীতে গন্ধক পোড়াইয়া বায়ুকে জীবাণুমুক্ত করা উচিত।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা একটি ভয়ানক রোগ। ঐ রোগ হইলে রোগী সহজে বাঁচে না এবং বাঁচিলেও চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ—ঐ রোগ হইলে অনেক সময় প্রথমে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। হঠাৎ একদিন রক্ত বমি হইতে আরম্ভ করে। পরে সব

সময় খুব কাশি হইয়া থাকে এবং অল্প জ্বরও হয়, মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে ও শেষে মরিয়া যায়।

আবার অনেকের প্রথমে খুব অল্প জ্বর হইতে আরম্ভ হয়। বিকালের দিকে সামান্য জ্বর হয় ও শরীর খারাপ বোধ হয়। শীতের রাত্রেও পিঠ ঘামে। কাশিও থাকে। পরে একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। তাহার পর প্রায়ই রোগী রক্ত বমি করে এবং শীর্ণ ও দুর্বল হইতে থাকে।

রোগের কারণ—এই রোগেরও জীবাণু আছে। ঐ জীবাণুকে ইংরাজীতে টি, বি, বলে। ঐ জীবাণুও বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। সুস্থ ব্যক্তির প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের মধ্যে ঐ জীবাণু গেলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগ হয়।

ঐ জীবাণু শরীরের অন্য স্থানে—যথা অন্ত্র বা হাড়ের মধ্যেও থাকিতে পারে। ইহাতেও লোক অসুস্থ হয়। কিন্তু ঐ জীবাণু যখন ফুস্‌ফুসে পেঁাছে তখন ফুস্‌ফুস্‌ পচিতে আরম্ভ হয়। সেইজন্য কাশির সহিত রক্ত উঠে।

রোগসংক্রমণ—যক্ষ্মা রোগীর থুথু, কফ, হাঁচি প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর জীবাণু বায়ুতে বাহির হইয়া আসে। ঐ বায়ু প্রশ্বাসের সঙ্গে টানিলে লোকের ঐ রোগ হয়। রোগীর রক্ত ও থুথু হইতে মাছির পায়ের লোমের সঙ্গেও ঐ জীবাণু খাদ্য দ্রব্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই খাদ্য খাইলেও ঐ রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা—এই রোগের কোন ভাল অথবা সহজ চিকিৎসা নাই। এই রোগ হইলে উন্মুক্ত সূর্যকিরণে যথাসম্ভব বেশী সময় রোগীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। দুইপ্রকার ইন্‌জেক্‌শন (ক্যালসিয়াম ও ষ্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন ইন্‌জেক্‌শন) করা হয় এবং ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়। ইহার ফলে অনেক রোগী ভাল হইয়া যায়। ঐরূপ রোগীকে কোন কাজ করিতে দেওয়া হয় না। পরিশ্রম করিলেই আবার রোগ দেখা দেয়।

রোগ প্রতিরোধ—এই রোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা, মুক্ত বাতাসে ও সূর্য কিরণে যথাসম্ভব বেশি সময় কাটানো প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা এবং বি, সি, জি, টিকা লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

অনুশীলনী

১। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও যক্ষ্মা—ইহাদের মধ্যে যে কোন দুইটি রোগ সম্পর্কে যাহা জান বল।

২। গ্রামে কলেরা বা বসন্ত হইতে আরম্ভ করিলে তুমি নিজে কি করিবে বল।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (ঘ)

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

কাহারও হাত কাটিয়া যাওয়া, আছাড় খাইয়া আঘাত পাওয়া, আগুনে শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার প্রত্যেক পরিবারে সর্বদা অল্প বিস্তর ঘটিয়া থাকে। চোখের সামনে ঐরূপ কোনও ব্যাপার ঘটিলে তৎক্ষণাৎ কি করা উচিত সেই সম্পর্কে এখানে আমরা সংক্ষেপে সামান্য আলোচনা করিব।

হাত, পা কাটিয়া যাওয়া—হাত পা অল্প কাটিয়া গিয়া কিছু রক্তপাত হইতে থাকিলে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ডেটল নামক প্রতিষেধক ঔষধ মিশাইয়া লইবে। ঐ জল দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া টিংচার বেনজোইন নামক ঔষধ লাগাইয়া দিবে। ইহাতে রক্ত বন্ধ হইবে এবং ক্ষত সহজে শুকাইয়া যাইবে।

বেশী কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে কাটা স্থানের দুই দিকে শক্ত সূতা দিয়া কষিয়া বাঁধিবে এবং ডাক্তারের নিকট খবর পাঠাইবে।

ডাক্তার আসিবার আগে অথবা রোগীকে ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবার আগে রোগীর ক্ষত স্থান বোরিক তুলা দিয়া চাপিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। কাটা স্থান বেশী সময় খোলা অবস্থায় রাখা ভাল নহে।

আগুনে পোড়া—আগুনে অল্প পুড়িয়া গেলে অথবা গরম জল বা তেলে শরীরের কোন স্থান পুড়িলে ঐ স্থানের উপর ক্রমাগত স্পিরিট দিতে হইবে। একটা নেকড়া স্পিরিট দ্বারা ভিজাইয়া লইয়া বারবার ঐ স্থানের উপর প্রলেপ দিলে ফোস্কা পড়ে না এবং ধীরে ধীরে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

যদি গন্‌গনে কয়লার উপর পা পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চামড়া সরিয়া যায় তবে স্পিরিট দিবে না। কড্‌লিভার অয়েলে নেকড়া ডুবাইয়া লইয়া উহা ক্ষত স্থানের উপর সাবধানে মেলিয়া রাখিবে।

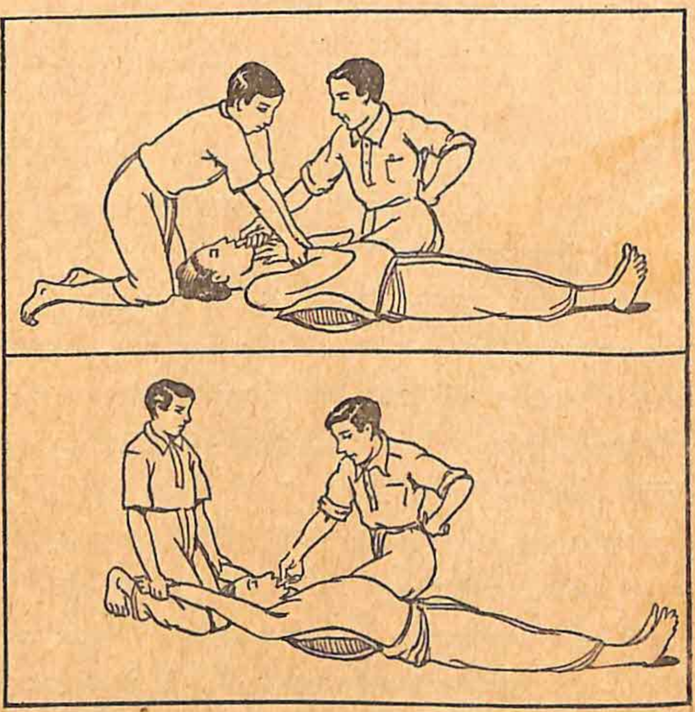
যদি কাপড় বা জামাতে আগুন ধরে তবে সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া ফেলিবে নতুবা কাঁথা বা কম্বল জাতীয় কোন ভারী কাপড় দিয়া জড়াইয়া ধরিবে। আর নিজেরই ঐরূপ হইলে এবং কাঁথা বা কম্বল জাতীয় কোন জিনিস নিকটে না থাকিলে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে। তাহাতেও আগুন নিভিয়া যাইবে।

কাপড় চোপড়ে আগুন লাগিলে চীৎকার করিবে কিন্তু কখনও দৌড় দিও না। দৌড়াইলে সমস্ত কাপড়ে আগুন ধরিয়া যাইবে।

জলে ডোবা—কোনও লোক জলে ডুবিয়া যাইতেছে দেখিলে তোমরা চীৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতে চেষ্টা করিবে। যথাসময়ে সবল লোক আসিয়া পড়িলে হয়তো সে জল হইতে লোকটিকে তুলিতে পারিবে। জলে ডুবিয়া যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে ডুবন্ত লোকটিকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া যথাযথ ভাবে চেষ্টা করিলে হয়তো তাহাকে বাঁচানো যাইতে পারে।

জল হইতে তুলিয়া আনার পর প্রথমেই উহার মুখ ও নাক হইতে কাদা, মাটি প্রভৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। আবশ্যক হইলে মুখ ফাঁক করিয়া রুমাল দিয়া মুখের ভিতর মুছিয়া আনিতে হইবে।

ইহার পর রোগীকে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া রাখিতে হইবে। পরে কোমরটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাতে রোগীর নাক ও



কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী

মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবে। আবার তাহাকে উপুড় করাইয়া মাটিতে শোয়াইয়া দিতে হইবে। তখন মাথাটা একদিকে কাত করিয়া রাখিতে হয় এবং হাত দুইটি সামনের দিকে ছড়াইয়া দিতে হয়।

ঐ অবস্থায় রাখিয়া রোগীর পাঁজরার হাড়ের নীচের দিকে দুই হাত রাখিয়া জোরে চাপ দিতে হইবে এবং পর মুহূর্তে চাপ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া কিছু সময় চালাইলে রোগী না মরিয়া থাকিলে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তখনও আরও কিছু সময় ঐ ভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাইতে হইবে। যদি দুইজন লোক উপস্থিত থাকে তাহা হইলে চিত্রে প্রদর্শিত মতে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাইবার চেষ্টা করিলে আরও ভাল ফল হয়। এজন্য রোগীর পিঠের নীচে একটা বালিশ দিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে। একজন রোগীর জিহ্বা টানিয়া ধরিবে এবং অপরজন ক্রমান্বয়ে রোগীর দুই হাত মাথার দিকে সটান করিয়া পরে দুই হাত বুকের দুই পাশে গুটাইয়া রাখিয়া চাপ দিবে।

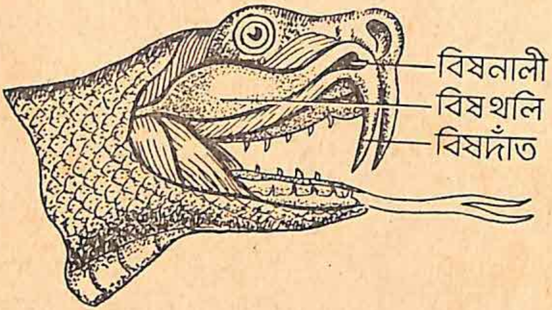
ইতি মধ্যে ডাক্তার আসিলে ইন্‌জেক্‌শন ও ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবেন; নতুবা রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে।

কুকুরে কামড়ান—কোন লোককে কুকুরে কামড়াইলে দেখিতে হইবে, যে কুকুর লোকটিকে কামড়াইয়াছে উহা পাগল কিনা। লোকটির ক্ষতস্থানে টিংচার আয়োডিন লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে এবং কুকুরটি দশ দিনের মধ্যে মারা পড়ে কিনা দেখিতে হইবে। কুকুর দশ দিনের মধ্যে মরিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে কুকুরটি পাগলা ছিল। এরূপ স্থলে রোগীকে নিকটস্থ সহরের সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন লওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে রোগীর জলাতঙ্ক রোগ হইবে। ঐ রোগ হইলে রোগী জল দেখিলে ভয় পায় এবং শেষে রোগীও প্রায় পাগলের মত হইয়া মরিয়া যায়। সুতরাং আগেই সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সর্পাঘাত—সাপে কামড়াইলে প্রথমেই ক্ষত স্থানের উপরে দড়ি বা কাপড়ের পাড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। ক্ষত স্থান হইতে

হৃৎপিণ্ডের দিকে যে পথে রক্ত যায় সেই পথে হৃৎপিণ্ড হইতে যতদূর সম্ভব ঐ বাঁধন দিতে হইবে।

ইহার পর ক্ষত স্থান ভালরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। বিষাক্ত সাপের কামড়ে ক্ষত স্থানে স্পষ্ট দুইটি দাগ দেখা যায়, দুইটি স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে দেখিলে বিষাক্ত সাপে কামড়াইয়াছে বুঝিতে হইবে।



বিষধর সর্পের বিষ দাঁত

ঐরূপ হইলে ক্ষত স্থানের চারিদিকে ধারালো ব্লেড বা নরুন দিয়া অল্প অল্প চিরিয়া দিতে হইবে। পরে চারিদিকে চাপ দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া পটাশ পারমাঙ্গানেট ঘষিয়া দিতে হইবে। বিষ নষ্ট করিবার জন্য কোন ডাক্তারের সাহায্যে এণ্টিভেনিন নামক ঔষধ রোগীর শিরার মধ্যে বা ক্ষত স্থানের নিকট ইন্‌জেক্‌শন করিলে অনেক সময় রোগী বাঁচিয়া যায়।

অনুশীলনী

১। হাত পা অল্প কাটিয়া গেলে কি করিবে?

২। কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেলে কি করিবে? গরম জল পড়িয়া পা পুড়িয়া গেলে কি করিবে?

৩। জলে-ডোবা রোগীকে কিভাবে সাহায্য দিতে হয়?

৪। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে কি করিতে হয়?

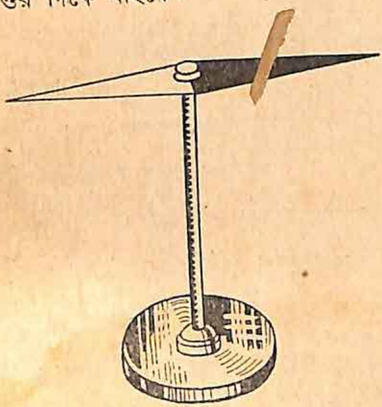
৫। সাপে কামড়াইলে সাপ বিষধর কিনা কিরূপে বোঝা যাইবে? বিষধর সাপে কামড়াইলে কি করিতে হয়?

নবম অধ্যায়

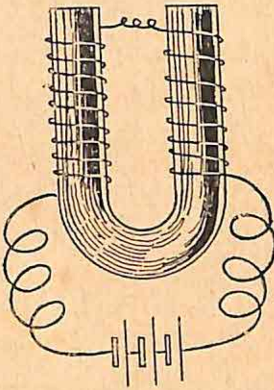
চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে সহজ আলোচনা

চুম্বক—এশিয়া মাইনরের নিকট মাটির নীচে পাথরের মত একপ্রকার জিনিস পাওয়া যায় তাহাকে স্বাভাবিক **চুম্বক** বলে।

ঐ পাথরের এক টুকরা লোহার গুঁড়ার মধ্যে রাখিলে উহা লোহার গুঁড়াকে আকর্ষণ করে। আবার ঐ পাথরের এক টুকরা সুতা দিয়া ঝুলাইয়া দিলে পাথরের টুকরার এক নির্দিষ্ট প্রান্ত উত্তর দিকে গিয়া স্থির হইয়া থাকে। অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিলেও বারবার ঐ একই প্রান্ত উত্তর দিকে যাইবে।



শলাকা চুম্বক



বৈদ্যুতিক চুম্বক

আবার ঐ পাথর দিয়া সাধারণ লোহাকে ঘষিলে লোহারও ঐ দুই গুণ জন্মিবে। তখন ঐ লোহার টুকরাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে।

কৃত্রিম চুম্বক নানা রকমের হয় এবং নানা কাজে ইহার ব্যবহার আছে।

চুম্বকের ব্যবহার—চুম্বক যে শুধু লোহাকেই টানে এমন নয়, উহা নিকেল, কোবাল্ট এবং ক্রোমিয়ামকেও টানে। আজকাল নূতন টাকা, আধুলি প্রভৃতি নিকেল দ্বারা তৈরী হইতেছে। সুতরাং বাজারে ব্যবসায়িগণ এখন এক খন্ড চুম্বকের সাহায্যে টাকা আসল কি নকল তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

শলাকা আকৃতির চুম্বক প্রস্তুত করিয়া উহাকে একটি পিতলের খাড়া সূচ বা কীলকের উপর বসাইয়া শলাকা-চুম্বক প্রস্তুত করা হয়। ইহার সাহায্যে দিক স্থির করা যায়। ইহার যে প্রান্ত উত্তর দিকে থাকে তাহা স্থায়ীভাবে চিহ্নিত থাকে। সুতরাং ঐ প্রান্ত যে দিকে থাকে তাহা দেখিয়া অন্যান্য দিক স্থির করা যায়।

এই কারণে বিশেষ ধরণের শলাকা-চুম্বকের সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজে দিক নির্ণয় করা হয়। ইহাকে নাবিকদের **কম্পাস** বলে।

নরম লোহার উপর তামার তার জড়াইয়া ঐ তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে দেখা যায় যে, নরম লোহার টুকরা চুম্বক হইয়া যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নরম লোহার চুম্বক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চুম্বককে **বৈদ্যুতিক চুম্বক** বলে।

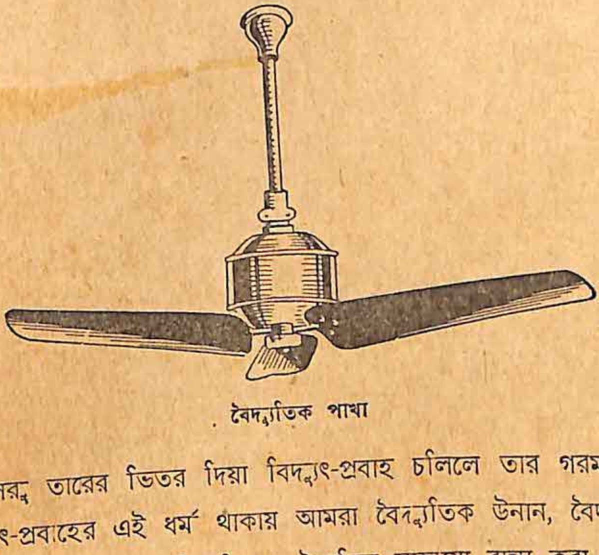
তড়িৎ-ঘন্টা, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু যন্ত্রে বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

আকাশে মেঘ জমিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায় এবং প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হইয়া থাকে ইহা তোমরা জান।

কিন্তু আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার দ্বারা যে সুবিধা ভোগ করি তাহা পাইতে হইলে বিদ্যুতের কলঘরে ক্রমাগত ডাইনামো নামক এক যন্ত্র চালাইতে হয় অথবা ব্যাটারি ব্যবহার করিতে হয়। জলের যেমন স্রোত বহে সেইরূপ তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের স্রোত বহিতে থাকে।

সুতরাং তারের ভিতর দিয়া যে বিদ্যুৎ চলে তাহাকে **বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা তড়িৎ-প্রবাহ** বলে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের ব্যবহার—বড় বড় শহরে আজকাল ডাইনামো নামক যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। ঐ প্রবাহ তারের ভিতর দিয়া চালাইয়া আমরা ইহা দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লই।

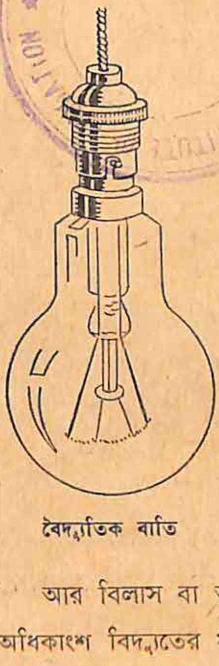


বৈদ্যুতিক পাখা

সরু তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিলে তার গরম হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই ধর্ম থাকায় আমরা বৈদ্যুতিক উনান, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছি। ঐগুলির সাহায্যে রান্না করা, কাপড় ইস্ত্রি করা প্রভৃতি কাজ চলে।

তার খুব সরু হইলে উহা গরম হইয়া শেষে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করিতে থাকে। সেইজন্য আমরা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাইয়া অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছি। সুইচ টিপিলেই ঘর আলোয় ভরিয়া যায়, আবার বিপরীত দিকে সুইচ টিপিলেই আলো নিভিয়া যায়। এত সহজে অন্য কোন ব্যবস্থায় আলো পাওয়া যায় না।

বড় বড় সহরে রাত্রে রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয়। সন্ধ্যা হইতে না হইতে সহরের বিভিন্ন কলঘর হইতে সুইচ টিপিয়া রাস্তার সব আলো জ্বালাইয়া দেওয়া যায়, আবার ভোর বেলা কলঘরে থাকিয়াই সুইচ ঘুরাইয়া দিয়া সমস্ত বাতি নিভানো যায়।



বৈদ্যুতিক বাতি

শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন বাল্‌ব বা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করিয়া আমরা কম বা বেশী উজ্জ্বল আলো পাই।

বৈদ্যুতিক পাখা চালাইতে হইলেও সুইচ টিপিয়া দিলেই হইল—পাখা বন্‌বন্‌ করিয়া আপনা হইতে ঘুরিয়া চলিবে।

আজকাল বহু কলকারখানা শুধু বিদ্যুতের জোরেই চলে। চাউলের কল, কাপড়ের কল, ছাপাখানা, প্রভৃতি বিদ্যুতের জোরে চলিতেছে। সুতরাং বলা যায় যে, আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্যও আমাদিগকে বিদ্যুতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

আর বিলাস বা আরামের জন্য যে সব জিনিস আছে তাহাদেরও অধিকাংশ বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা ভোগ করিতে পারি। সিনেমা, রেডিও, মাইক প্রভৃতি এখন প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ না হইলে এইগুলি অচল।

পল্লীগ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে এখন বৈদ্যুতিক টর্চ লাইট ব্যবহৃত হয়—ইহাও বিদ্যুতের ব্যবহারের উদাহরণ। কিন্তু এই বিদ্যুৎ ডাইনামো দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহার জন্য ব্যাটারি আবশ্যক হয়। অল্প বিদ্যুৎ অল্প